ফসল উন্নয়ন ও প্রযুক্তি

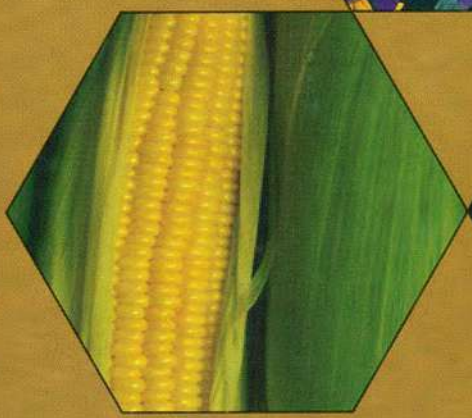

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

ফসলের আবাদ যাযাবর মানুষকে স্থায়ী হয়ে বসবাস করার এক পরম সুযোগ এনে দিয়েছিল। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ থেকে শুরু হয়েছে মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশ। ফসলকে অবলম্বন করে মানুষের সেই অভিযাত্রা আজ এক সভ্যতার নতুন মাত্রায় এনে দাঁড় করিয়েছে। আমরা এখন আধুনিক মানুষ হয়েছি। আমাদের ফসলও উন্নয়নের ছোঁয়ায় আধুনিক ফসল হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীদের নিরন্তর গবেষণার ফলশ্রুতিতে ফসলের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। আমাদের নানা মাত্রিক চাহিদার নিরিখে উদ্ভাবিত হচ্ছে ফসলের নতুন নতুন সব জাত। উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন সব উৎপাদন প্রযুক্তি। এরই কিছু বাছাই করা বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গ্রন্থের অবয়ব। এসব প্রবন্ধের সিংহভাগই ইতোপূর্বে এদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একটুখানি পরিমার্জন আর সংশোধন করে এদের একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করা হলো। নানা রকম ফসল এবং এদের উন্নয়ন এবং ফসল সংক্রান্ত নানাবিধ প্রযুক্তি নিয়ে যারা ভাবেন তাদের এই গ্রন্থটি কিছুটা হলেও কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

ফসল উন্নয়ন
ও
প্রযুক্তি

ফসল উন্নয়ন
ও
প্রযুক্তি

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার

ফসল উন্নয়ন ও প্রযুক্তি

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/ জুলাই ২০১২
মুদ্রণ সংখ্যা
৬০০ কপি
© লেখক
প্রচ্ছদ
ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
মোঃ হারুন-উর-রশিদ
মোঃ আক্কাচ আলী
প্রকাশক
মোঃ আব্দুল কাদের
প্রোগ্রেসিভ বুক কর্ণার
১/১ মিরপুর রোড, হযরত শাহজালাল মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

উৎসর্গ

কায়কোবাদ, বিউটি, খোকন, বাবলু ও শিল্পীকে

মুখবন্ধ

জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখার কিছু বিপদ রয়েছে। বিষয়বস্তুকে চিত্তগ্রাহী করার জন্য বিজ্ঞানকে বিসর্জন দেবার কিংবা মূল বিজ্ঞানকে খানিকটা পাশ কাটিয়ে যাবার ঝুঁকি থেকে যায়। তাছাড়া বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ধারায় প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা নেহায়েত কম কঠিন কাজ নয়। এ কেবল বিজ্ঞান নয় কিংবা এ কেবল ভাষার সাবলিলতা নয় বরং সাবলিল ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়কে সকলের জন্য বোধগম্য ও আকর্ষনীয় করে তোলা। এর জন্য যে সাধনা ও অধ্যবসায় দরকার তা আমার নেই। শিল্পীর প্রকাশের যে তাগিদ সেটি শিল্পীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় বলেই পাথরের কঠিন শরীর ভেদ করেও অংকিত হয়েছে গুহাচিত্র। পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সেখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। চিত্রের মান সেখানে ক্লাসিক ধারার অন্তর্ভূক্ত না হলেও অপ্রতিরোধ্য আবেগের প্রকাশ ও তথ্য পরিবেশনে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। লক্ষ্য যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা কথা সকলের বোধগম্য করে উপস্থাপন করা তখন ভাষার সীমাবদ্ধতা কি সে পথ রুদ্ধ করতে পারে ?

কৃষি মানুষের এক অতি প্রাচীন পেশা। আবার কৃষির আবিষ্কারই মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। কৃষিকে অবলম্বন করে সেই যে মানুষের পথ চলতে শুরু করা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। অতি প্রাচীন হলেও কৃষি আজও তাই অতি নবীন। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সে এক নতুন রূপ, নতুন অবয়ব লাভ করে চলেছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সুবাদে বেঁচে থাকার কৃষি দিন দিন বাণিজ্যিক কৃষিতে পর্যবসিত হচ্ছে। আধুনিক কালে এসে কৃষির তথা ফসলের পরিবর্তনের এই যে নানা ধারা তারই কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থের এক একটি প্রবন্ধ। কৃষি এখন আর মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল জোয়াল আর গরু কাহিনী নয়। এটি এখন বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর এক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার ছোঁয়ায় ফসলের জাত উন্নয়ন এবং ফসল আবাদের সহায়ক নানা আধুনিক প্রযুক্তি এসে এক স্রোত ধারায় মিলতে শুরু করেছে। তার কিছু খন্ড খন্ড ঘটনা আর প্রযুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে গড়ে ওঠেছে এ গ্রন্থের অবয়ব। এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ এদেশের কোন কোন বিজ্ঞান পত্রিকায় ইতোমধ্যে প্রকাশিতও হয়েছে। বিষয়ের কিছুটা ভিন্নমুখীনতা থাকলেও এদের মধ্যে এক আশ্চর্য মিলও রয়েছে। একটিকে ছাড়া অন্যটি চলেনা। সে কারণেই এদের একত্রে নিয়ে আসবার প্রয়াস। পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে আমার প্রচেষ্টা সফল হবে।

গ্রন্থটির প্রতিটি প্রবন্ধ পাঠ করে নানা বিষয়ে মন্তব্য প্রদান করে একে ত্রুটিমুক্ত রাখার কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে আমার ছাত্র ও বর্তমান সহকর্মী মোঃ হারুন-উর-রশিদ। আমি তার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মুদ্রণের কাজে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আমি আমার পিএইচ.ডি. ছাত্র মোহাঃ আক্কাচ আলী-এর কাছেও ঋণী। ঋণী আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছেও কারণ যে সময়টি আমার তাদের দেবার কথা সেটি গেছে এই গ্রন্থটির পেছনে।

জুলাই ২০১২

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

সূচিপত্র

ফসলের জিন সম্পদ	১
ফসলের বুনো আত্মীয়দের গুরুত্ব	৯
শতবর্ষের ফসল উন্নয়ন ধারা	১৫
ট্রিটিক্যাল	২২
ফসলের হাইব্রিড জাত	২৬
বাংলাদেশের হাইব্রিড ধানের সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩৪
হাইব্রিড ভুট্টা	৪১
হাইব্রিড সব্জি	৪৬
হাইব্রিড ফুল	৫১
জি এম ফসল কি ও কেন	৫৫
জি এম ফসলের হাল হকিকত	৬৪
আগাছানাশক প্রতিরোধী জি এম ফসল	৭০
জি এম ফুল	৭৬
সবজি বীজ উৎপাদন ও পরাগায়ন	৮০
বীজহীন ফল	৮৫
ফসলের কৃত্রিম বীজ	৮৯
ফসলের নিষেকবিহীন বীজ	৯৬

ফসলের জিন সম্পদ

যতদিন আমাদের উদর পূর্তির জন্য আমরা ফসলের উপর নির্ভরশীল থাকবো ততদিন আমাদের নানা মাত্রিক চাহিদা পূরণের জন্য নতুন নতুন ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে। আর নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হলে উদ্ভিদ প্রজননবিদদেরকে ফসলের জাত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। এটি চলবে নিরন্তর, কারণ আমাদের নতুন নতুন জাতের চাহিদাও থাকবে নিরন্তর। এই নিরন্তর ফসল উন্নয়ন কর্মসূচী চালিয়ে যাবার প্রধানতম শর্ত হলো এই যে, উদ্ভিদ প্রজননবিদদেরকে ফসলের নানা রকম জিন সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ফসলের জিন সম্পদ হলো ফসল উন্নয়নের প্রধান কাঁচামাল। এদের বলা হয় জার্মপ্লাজম বা কৌলি সম্পদ। কখনও বলা হয় জিন সম্ভার বা জিন সম্পদ। এরা হলো নানা রকম বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনের উৎস। আমাদের প্রয়োজনে ফসলের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব জিনকে আমরা আমাদের ফসলে সংযোজন করে নিই।

ফসলের কৌলি সম্পদ বা জার্মপ্লাজম আসলে আমাদের ফসলের জাতগুলোর নানা স্তরের আত্মীয়স্বজন। আমাদের যেমন নানা রকম আত্মীয়স্বজন রয়েছে তেমনি আমাদের ফসলেরও কাছের দূরের নানা রকম আত্মীয়স্বজন রয়েছে। কোন ফসল প্রজাতির সব স্তরের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিদ্যমান জিনই হলো ঐ ফসলের কৌলি সম্পদ। সংকরায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রয়োজন মাফিক এসব জিন আমরা আমাদের ফসলে আহরণ করে নিয়ে থাকি। ইদানিংকালে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করেও যে কোন কৌলি সম্পদ থেকে জিন ফসলে সংযোজন করে নিয়ে ফসল উন্নয়ন সাধন সম্ভব হচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন ফসলের জিন সম্পদ রক্ষার বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীদের তেমন কোন ভাবনা ছিল না। আমাদের কৃষকগণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজন মাফিক দেশের নানা অঞ্চলে তাদের উদ্ভাবিত নানা রকম জাত আবাদ করতেন। এ রকম আবাদের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর ফসলের জিন সম্পদ প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই রক্ষিত হতো। তখন এদের সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার কোন প্রয়োজন হতো না।

দিন দিন মানুষ বেড়েছে। বেড়েছে খাদ্য শস্যের চাহিদা। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে আগের মত সব রকমের ফসলের জাত আবাদ করা আর সম্ভব হলোনা কৃষকের। অনেক জাতের মধ্য থেকে তাকে বাছাই করে নিতে হলো তুলনামূলকভাবে অধিক ফলন দেয় তেমন জাত। সেই থেকে শুরু হলো জাত বাছাই করে নেবার কাজ। আর তখন থেকেই শুরু হলো ফসলের অনেক জাত বর্জন করার কাজটিও। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে এসে আমাদের দেশে শুরু হলো বিজ্ঞান ভিত্তিক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। এবার শুরু হলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অধিক ফলনশীল জাত বাছাই করার কাজ। অনেক জাতের ভেতর থেকে একদিকে যেমন উত্তম জাতগুলো আলাদা করে নেওয়া শুরু হলো অন্য দিকে তেমনি শুরু হলো উত্তম জাতের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে থাকা তুলনামূলকভাবে খারাপ লাইনটিকে বাদ দিয়ে উত্তম লাইনটিকে আলাদা করে নেওয়ার কাজ। তাতে স্থানীয় জাতের ফসল থেকে পাওয়া গেল স্থানীয় উন্নত জাত। আর এসব জাত কৃষকের মাঠে অধিকতর সফল হওয়ায় স্থানীয় জাতগুলো ধীরে ধীরে চলে গেল আবাদের আওতার বাইরে। এদের আর সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার দায় কৃষকগণের উপর থাকলো না।

এবার এর সাথে যুক্ত হলো উচ্চ ফলনশীল বা উফশী জাত। উফশী জাতগুলোর ফলনশীলতা কৃষকগণকে মুগ্ধ করলো। কৃষকগণ এসব জাত আবাদের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগও উফশী জাতের প্রসার ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলো। এ দেশের বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন উফশী জাত উদ্ভাবন করতে থাকলেন। কৃষক সেসব জাত থেকে এক বা একাধিক জাতের আবাদ করতে অধিক মনযোগী হলেন ফলে অনেক ফসলের স্থানীয় জাতগুলো অবহেলার শিকার হলো। কোন কোন স্থানীয় জাত একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কোন কোনটা বিলুপ্তির হুমকির মুখে পড়ে গেল।

তাছাড়া অধিক ফসল ফলাবার জন্য এতদিন পড়ে থাকতো যেসব জমি সেসব জমিও মানুষ আবাদ করতে শুরু করলো। পতিত জমি চলে এলো আবাদের আওতায়। রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, বাজার, ঘর বাড়ি, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করতে যেয়ে নষ্ট করতে হয়েছে বন জঙ্গল। ফলে কেটে ফেলতে হয়েছে নানা বৃক্ষ, এরই সাথে নষ্ট হয়ে গেছে ফসলের কত জানা অজানা আত্মীয়স্বজন। এমনকি পাহাড়ী এলাকার জিন সম্পদও আর আগের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকতে পারছেনা। পাহাড়ের কৃষির পরিবর্তন এবং পাহাড়ে নানা রকম ফসলের বিস্তার সেখানে প্রাকৃতিক অবস্থায় সংরক্ষিত কৌলি সম্পদও নষ্ট করে দিচ্ছে।

এরকম যখন অবস্থা তখন বিভিন্ন ফসলের দেশী জাতগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষণের কথা জোরেসোরে উত্থাপিত হলো। আন্তর্জাতিক বহু সংস্থা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলো। কোন কোন সংস্থা জিন সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য অর্থায়নে এগিয়ে এলো। কোন কোন সংস্থা দিল কারিগরী সহায়তা। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য অধিকাংশ ফসলের উৎপত্তি স্থল হলো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো। এসব সম্পদ সংগ্রহ করার কারিগরী জ্ঞান ও সংরক্ষণ করার ভৌত অবকাঠামো এসব দেশের ছিলনা। মূল্যবান এসব জিন সম্পদ সংগ্রহের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবার জন্য এসব সম্পদকে Common Human Heritage বলে আখ্যায়িত করা হলো। মানব গোষ্ঠির কল্যাণের জন্য যে এসব কৌলি সম্পদ ভবিষ্যৎ এ ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে নানা প্রচার মাধ্যমে তা বার বার উচ্চারিত হলো।

ফসলের আত্মীয়দের বিলুপ্তির কথা বুঝতে পেরে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ফসলের এসব আত্মীয়স্বজন তথা ফসলের জিন সম্পদকে রক্ষা করার জন্য অতঃপর শুরু হয়ে গেল এসব জিন সম্পদ অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ। যেসব দেশে ফসলের উৎপত্তি ঘটেছে সেসব দেশের উৎপত্তিস্থল থেকে বিজ্ঞানীরা সত্তর আশির দশক জুড়ে সংগ্রহ করেছেন অনেক জিন সম্পদ। সৃষ্টি করা হয়েছে বহু আন্তজার্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের জিন ব্যাংকে সারা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সংগৃহীত জিন সম্পদ এনে জড়ো করা হয়েছে। এ শর্তে এসব জিন সম্পদ জিন ব্যাংকগুলোতে জমা করে রাখা হয়েছে যেন প্রয়োজনের সময় এসব জিন সরবরাহকারী দেশগুলো চাহিদা মাফিক পেতে পারে। এমনকি এসব জিন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যেসব উন্নত ফসলের জাত তৈরি করা হলে তাও যেন ভাগ করে নেওয়া যায় জিন সম্পদ প্রদানকারী দেশগুলোর সাথে। এটাও শর্তের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আমাদের দেশেও সে সময় শুরু হয় ফসলের কৌলি সম্পদ সংগ্রহের কাজ। আর এ কাজ করার জন্য চলে আসেন বিদেশী বিশেষজ্ঞ, অর্থায়ন করে কোন কোন বিদেশী দাতা সংস্থা। এদের সংরক্ষণের জন্য ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির কাজও একই সাথে হয় বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে জিন ব্যাংক বি.জে.আর.আই, বি.আর.আর.আই এবং বি.এ.আর.আইতে। ধানের সংগৃহীত জিন সম্পদের এক কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে বি.আর.আর.আই জিন ব্যাংকে। পাট আর তুলার বীজের এক কপি সংরক্ষণ করা হলো বি.জে.আর.আই জিন ব্যাংকে। কালক্রমে এটি আবার আন্তর্জাতিক সংরক্ষণাগার (international depository)

হিসেবে পরিগণিত হলো। এসব ফসল ছাড়া অন্য সব ফসলের জিন সম্পদ সংরক্ষণ করা হলো বি.এ.আর.আই কৌলি সম্পদ কেন্দ্রের জিন ব্যাংকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ ফসলের উৎপত্তিস্থল হলো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো। নিজেদের এসব জিন সম্পদ নিজের দেশের জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা থাকলেও এসব জিন সম্পদকে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে লাগাবার ব্যবস্থা খুব একটা তাদের নেই। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ায় নিজের জিন সম্পদ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা ও এদের ব্যবহার নিশ্চিত করার সামর্থ তাদের অনেকেরই নেই। ধনী দেশগুলো জিন সম্পদে দরিদ্র কিন্তু তারা অর্থনৈতিকভাবে সবল। এসব ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশের জিন সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়েছে নানা কৌশলে। পরম যত্নে তারা আগলে রাখছে এসব জিন সম্পদ। কোন ফসলেরই উৎপত্তি ঘটেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা ভাবে জিন সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়ে তাদের কৃষির যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি ফসল যেমন- ভুট্টা, গম, ধান ও সয়াবিনের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদনকারী দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র। সংগ্রহ করা জিন সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যাত্রা করা কৃষি আজ অত্যন্ত শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এজন্য বুঝি জিন সম্পদের কদর তাদের মতো আর কেউ বুঝতে পারেনা। যে কারণেই বিশাল আকৃতির আর কঠিন নিরাপত্তা বিধান করে তারা গড়ে তুলেছে একাধিক জিন ব্যাংক। যুক্তরাষ্ট্রের কোলোরাডোর ফোর্ট কোলিন্সে তেমনি একটি জিন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে ন্যাশনাল সীড স্টোরেজ ল্যাবরেটরীতে। ১৯৫৯ সালে গড়ে ওঠা এ জিন ব্যাংকটিকে সরকারী অর্থায়নে অত্যন্ত আধুনিক সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে ১৯৯২ সনে। বর্তমানে এই জিন ব্যাংকটিতে জমা রয়েছে ৪০০ উদ্ভিদ প্রজাতির ২৫০,০০০ ভূক্তি। আর এই ব্যাংকটির মোট ধারণক্ষমতা হলো দশ লক্ষ ভূক্তি। এই ব্যাংকটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন। এই ভবনটি অগ্নি প্রতিরোধক ও এটি বন্যা, টর্নেডো এবং ভূমিকম্প সহনশীল। তারা জানে এখানে টাকা নয় বরং কৃষির প্রাণ সম্পদ ফসলের কৌলি সম্পদ এখানে সংরক্ষিত, যা একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এসব সংগৃহীত জিন সম্পদ থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন আলাদা করে নিয়ে তারা তা জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলে সংযোজন করে তৈরি করছে ফসলের উন্নত জাত। যে ব্যক্তি বা কোম্পানী উন্নয়নের কাজটি করছে তারা নতুন জাতটি তাদের নামে পেটেন্টিং করে নিচ্ছে। এ পেটেন্টিং-এর সুবাদে নতুন জাতটি বাজারজাত করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে নিচ্ছে।

'সকলের সাধারণ সম্পদ' এই শ্লোগানকে অবলম্বন করে ধনী দেশগুলো জিন সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়েছে দরিদ্র কিন্তু জিন সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো থেকে। আজ

এসব জিন আলাদা করে নিয়ে নিজে মুনাফা লুটছে ধনী দেশগুলো। তাছাড়া পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলো থেকে সংগৃহীত এসব জিন সম্পদ থেকে আলাদা করে নেয়া জিনেরও তারা পেটেন্টিং করে তা আবার নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করে সরবরাহ করছে অন্য দেশে। যাদের জিন তাদের এখন এসব জিন পেতে হচ্ছে পয়সার বিনিময়ে।

জিন প্রযুক্তির সাফল্য ফসলের জিন সম্পদকে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এতদিন জিন ব্যাংকে ফেলে রাখা ফসলের আত্মীয় প্রজাতির জিন বলতে গেলে অব্যবহৃতই থেকে গেছে। এখন বুনো আধাবুনো আত্মীয়স্বজনের পাশাপাশি আগাছার কোন কোন বৈশিষ্ট্যকেও ফসল উন্নয়নের কাজে লাগাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে তাই এখনও যেসব ফসলের জিন সম্পদ তাদের হাতে পৌছেনি সেগুলো পেতে নানা রকম পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দরিদ্র দেশের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে জিন সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া। অনেক উন্নত দেশ এখন দরিদ্র দেশগুলোর স্কলারশীপ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ দেশের সমস্যা নিয়ে নিজ নিজ দেশের নির্দিষ্ট ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় এসব দেশের স্কলারশীপ পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট ফসলের জিন সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেদের সাথে করে নিয়ে উন্নত দেশে চলে যাচ্ছে। অননুমোদিত অবস্থায় দেশের ফসলের জিন সম্পদ এভাবে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটি জিন সম্পদ পাচার হয়ে যাবার একটি আধুনিকতম উপায়। মূল্যবান জিন সম্পদ পাচার রোঁধে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোর আশু ব্যবস্থা নেওয়ার কোন উপায় নেই।

অন্যভাবেও চলে যাচ্ছে দেশের জিন সম্পদ। এদেশে ফসলের মাঠে ঘুরে বেড়াবার, ইচ্ছে মাফিক যেকোন ফসলের জাত সংগ্রহ করার অধিকার রয়েছে সকল নাগরিকের। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ছাড়াও যে কোন স্থান থেকে নানা ফসলের বীজ বা কন্দ এ দেশের নাগরিকগণ সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে। এমনকি বহু বিদেশী অর্থায়নের নাম করে এদেশী সহযোগীকে সাথে নিয়ে স্বশরীরে চলে গেছে এদেশের পাহাড়ী এলাকায়, বনে বাদাড়ে কৌলি সম্পদ অনুসন্ধান আর সংগ্রহের কাজে। কোন কোন বিদেশী এরকম সংগ্রহ অভিযানে চলে গেছে দুর্গম এলাকায় বারবার। এই যে যেকোন ফসলের জিন সম্পদ সংগ্রহের অবারিত সুযোগ আমাদের রয়েছে তারই সুযোগ নেয় এদেশের অনেক অসাধু বীজ ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মী, প্রাইভেট কোম্পানীর লোকজন বা অসৎ ব্যক্তিবর্গ। অনায়াসে এ দেশের ফসলের জিন সম্পদ সংগ্রহ করে তা পাচার করে দেয় টাকার বিনিময়ে অন্য দেশে। ব্যক্তিগত লাভের আশায় নির্দ্বিধায় এ সব মূল্যবান সম্পদ তুলে দেয়া হয় বিদেশীদের হাতে।

এদেশে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে জিন সম্পদ সংগ্রহের কর্মকাণ্ড চলছে অনেক দিনে ধরেই। বিদেশীরা এসব জিন সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে এদেশে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। এসব প্রকল্পের আওতায় নানা এনজিও কর্মীদের জিন সম্পদ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় দেশের নানা অঞ্চলে। এই ফাঁকে সংগৃহীত জিন সম্পদের এক কপি চলে যায় অর্থ প্রদানকারী দেশের প্রতিনিধিদের নিকট। আর এক সময় তা চলে যায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে। এদেশের জিন সম্পদ এভাবেই চলে গেছে এবং যাচ্ছে নানা পথ ধরে বিদেশের মাটিতে।

কৃষি প্রধান দেশের প্রায় সবগুলোতেই সুষ্ঠু জিন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কৌলি সম্পদ ইনস্টিটিউট রয়েছে যা আমাদের দেশে নেই। এটি না থাকায় জিন সম্পদ নিয়ে আমাদের কি কি সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সেটি ভালো করে বুঝতে হবে। জাতীয় কৌলি সম্পদ ইনস্টিটিউট না থাকায় প্রধানত যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা হলো-

- দেশের কৌলি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কোন একক কর্তৃপক্ষ নেই। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৌলি সম্পদ নিয়ে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৌলি সম্পদ বিষয়ক কোন আলোচনা বা সভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হয় না।
- দেশের কৌলি সম্পদ সংগ্রহ, বিতরণ বা বিনিময়ের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা গাইড লাইন নেই বলে কৌলি সম্পদ সংগ্রহের কাজ ব্যাহত হয়।
- দেশে বা বিদেশে কৌলি সম্পদ সংক্রান্ত সভায় নীতিগত বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়।
- দেশের কৌলি সম্পদ নানা পথে বিদেশে পাচার হচ্ছে। মূল্যবান এসব সম্পদ রক্ষার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন আইন অনুসরণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই।
- একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় আন্তর্জাতিক কৌলি সম্পদ নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্ক রক্ষা বিঘ্নিত হয়।
- দেশে বিদ্যমান ফসলের কৌলি সম্পদ সুরক্ষার জন্য সব ধরণের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ ও সঠিক ডাটা বেজ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না।

- সঠিক ভাবে কৌলি সম্পদ আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। কৌলি সম্পদের কেবল এক একটি করে কপি বিভিন্ন কৌলি সম্পদ কেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকায় যে কোন দূর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যাবার আশংকা থাকছে।
- ভিন্ন ভিন্ন জিন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হওয়ায় জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত বীজগুলোর নির্দিষ্ট মেয়াদে পুনরুৎপাদন করার কাজটি ঠিক মত হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করা সম্ভব হচ্ছে না।

অনেকের মনে আশংকা থাকতে পারে যে, জাতীয় কৌলি সম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলে বর্তমানে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান জিন ব্যাংকগুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। ফলে জিন ব্যাংকগুলোতে অর্থায়নের অভাব ঘটবে এবং পদ সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগ বাঁধাগ্রস্থ হবে। তাছাড়া জাতীয় ইনস্টিটিউট সৃষ্টি হলে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও ব্যবস্থাপকগণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করবে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জিন ব্যাংকে কর্মরত বিজ্ঞানীগণ সমস্যায় পড়বেন। এ নিয়ে কৌলি সম্পদ কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ তথা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের জাতীয় কৌলি সম্পদ ইনস্টিটিউট স্থাপনে কিছুটা অনীহা ভাব প্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দেশের মঙ্গলের জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউটের কোন বিকল্প নেই। কৌলি সম্পদ ইনস্টিটিউটের আইন বা অধ্যাদেশ প্রণয়নের সময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কৌলি সম্পদ কেন্দ্রগুলোর ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় কৌলি সম্পদ ইনস্টিটিউটের সাথে এগুলোর সম্পর্কের বিষয়গুলো উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইন/অধ্যাদেশে প্রতিফলন ঘটানো হলে কোন মহলেরই স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট নিয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়। হেলাফেলা করে অনেক সময় আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। কৌলি সম্পদ নিয়ে জাতীয় কর্তৃপক্ষের অভাবে আন্তর্জাতিক বহু চুক্তি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশ সঠিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এ অবস্থা বেশী দিন আর চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এ বিষয়ে সরকারের মনযোগ আকর্ষণ করার কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজন জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। জাতীয় ইনস্টিটিউটের সুফল বুঝাতে সক্ষম হলে এ কাজে সরকার অবশ্যই এগিয়ে আসবে। নিজের সম্পদ

হেলাফেলায় নষ্ট করে অন্যের উপর নির্ভর করার পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে এটি আমাদের বুঝতে হবে। আর তার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

কোন দেশই এখন সহজে নিজস্ব কৌলি সম্পদ হাতছাড়া করছে না। এমনকি কৌলি সম্পদ বিনিময়ও দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। নতুন নতুন জাত এবং বিভিন্ন জাত থেকে বাছাই করে নেওয়া জিনসমূহ এখন পেটেন্টের আওতায় নিয়ে আসার কারণে কৌলি সম্পদ পাচার রোধে এখন সবাই সচেষ্ট। কোন কোন দেশ নানা ছুতায় অন্যের জিন সম্পদ পেতে চাইলেও নিজের কৌলি সম্পদ অন্যের হাতে চলে যাক তা তারা চায় না। ধনী দেশগুলো এ বিষয়ে খুব সুবিধাজনক পর্যায়ে রয়েছে অথচ জিন সম্পদদের মালিক হয়েও দরিদ্র দেশগুলো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় নিজের দেশের কৌলি সম্পদ রক্ষায় তৎপর হতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আজ আর ফসলের জিন সম্পদ মানবকূলের সাধারণ সম্পদ নয়। একশত আশিটি দেশের স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে ১৯৯৩ সনের ২৯ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর কনভেনশন অন বায়োডাইভারসিটি (CBD) সনদের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের কৌলি সম্পদের উপর সার্বভৌম মালিকানার অধিকারী হয়ে উঠেছে প্রতিটি দেশ। এসব জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এদের টেকসই ব্যবহার এবং কৌলি সম্পদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যিক বা অন্যান্য ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ভাগ করে নেওয়া সংক্রান্ত তিনটি প্রধান লক্ষ্য বর্ণিত রয়েছে এই সনদটিতে।

দেশের কৌলি সম্পদ সংরক্ষণ এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এর সার্বভৌম মালিকানাসহ আমাদের ফসলের জিন সম্পদ থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য জীব বৈচিত্র্য আইন প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। অনেক দিন ধরেই এই আইনটির খসড়া তৈরি হয়েছে বলে শুনেছি, তবে এটি আইনে পরিণত হয়েছে তেমন কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। নিজের দেশের জীব বৈচিত্র্য রক্ষার এই আইনগত উদ্যোগ কেন বন্ধ হয়ে যায় তা আমরা জানিনা। আমরা এটুকু বুঝি এর পেছনে অন্য কোন দেশের ষড়যন্ত্র নেই বা এটি কোন বহুজাতিক কোম্পানির কোন বাণিজ্যিক পণ্য নয়। তাহলে কোন কারণে এ ধরনের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন বিলম্বিত হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে নিজেদের কৌলি সম্পদ তথা জীব বৈচিত্র্য রক্ষার আয়োজন সম্পন্ন করা নিজেদের জন্যই অতি জরুরী। কত দ্রুত এ বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নেব সেটিই এখন মূল বিষয়।

১

ফসলের বুনো আত্মীয়দের গুরুত্ব

আমাদের মতো আমাদের ফসলেরও রয়েছে নানা রকম আত্মীয়স্বজন। কেউ কাছের, কেউ আবার বেশ দূরের। কোন কোনটা আবার খুব কাছেরও নয় আবার খুব দূরেরও নয়। কাছের যারা এদের সঙ্গে ফসলের সহজেই পরাগ বিনিময় ঘটে এবং সে সূত্রে ঘটে জিন বিনিময়। দূরের যারা এদের সঙ্গেও ফসলের কখনও কখনও জিন বিনিময় ঘটে থাকে। ফসলের বুনো প্রজাতি আর ফসলের সঙ্গে ফসলের মাঠে জন্মে যেসব আগাছা এরাই হলো ফসলের দূর সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন। ফসলের কোন কোন আগাছাকে অবশ্য বুনো বা আধাবুনো হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। ফসলের মাঠে জন্মালেও এদের রয়েছে বহু বুনো বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষের চরম বৈরিতা সত্ত্বেও ফসলের মাঠে এরা টিকে থাকে অবলীলায়।

আমাদের সব ফসলের পূর্ব পুরুষেরাই কিন্তু এক সময় বুনো ছিল। এখন থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে এসব বুনো প্রজাতি থেকেই মানুষ তার প্রয়োজনীয় প্রজাতিগুলো চিহ্নিত করে নেয় আর এসব উদ্ভিদ সমষ্টি থেকে তার নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে সক্ষম তেমন সব উদ্ভিদ নির্বাচন করে নেয়। এভাবে শত সহস্র বৎসর ধরে নির্বাচন আর প্রজনন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বুনো প্রজাতি থেকে মানুষ আলাদা করে নিয়ে আসে তার কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ। অতঃপর নানা রূপ বদল আর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে এদের কোন কোনটা হয়ে পড়ে মানুষের ফসল। একটি বুনো প্রজাতির দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এভাবে ফসলে রূপান্তরিত হতে গিয়ে নানা স্তরে সে পেছনে ফেলে আসে এর বহু আত্মীয়স্বজন।

সনাতন কৃষি পদ্ধতি আর ভূমি ব্যবস্থাপনায় ফসলের এসব আত্মীয়স্বজন বেশ সহজেই টিকে ছিল প্রকৃতিতে। ফসলের মাঠে, এর আশেপাশের পতিত জমি, বন-জঙ্গল, নদী-নালার পাড়ে কিংবা পাহাড়-পর্বতের আনাচে কানাচে ফসলের বুনো আত্মীয়দের বেশ দেখা মিলতো। গত কয়েক দশকের ফসল উন্নয়নের সাফল্য আর আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা ফসলের বহু আগাছা নির্মূল করেছে। খাদ্য চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে কেবল যে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ শুরু হয়েছে তাই নয় বরং অনাবাদি পতিত জমি, এমনকি বন-জঙ্গল পরিস্কার করেও মানুষ নিয়ে আসছে আবাদের আওতায়। গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শহর বন্দর, রাস্তা-ঘাট, হাট-

বাজার ও স্কুল-কলেজ। পতিত জমির অভাবে গো-মহিষাদির চারণক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে বন-জঙ্গল পর্যন্ত। ইটের ভাটা আর আমাদের প্রতিদিনের রান্নার জ্বালানীর জন্য ধ্বংস হচ্ছে বন-বনাঞ্চল। বেধড়ক কর্তন করা হচ্ছে নানা রকম গাছপালা। আমাদের চারপাশের পরিবেশটাই কেমন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আর এসব কারণে নষ্ট হচ্ছে আমাদের ফসলের বুনো আত্মীয়দের বাসস্থান। আমাদের অলক্ষ্যে বিলুপ্ত হচ্ছে এদের কোন কোনটা। কোন কোনটা আবার বিলুপ্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

বুনো প্রজাতিদের বুনো পরিবেশে টিকে থাকার আশ্চর্য সব ক্ষমতা রয়েছে। রোগজীবাণু, কীটপতঙ্গ ছাড়াও নানা রকম বৈরী পরিবেশে এদের টিকে থাকতে হয়। হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসব বুনো প্রজাতির বৈরী পরিবেশে টিকে থাকার কৌশল অর্জন করেছে। অন্যদিকে আমাদের ফসলের মাঠে ফসলের প্রত্যাশিত ফলন পাবার জন্য আমরা নির্মূল করি আগাছা, নিয়ন্ত্রণ করি রোগবালাই আর কীটপতঙ্গ। এদের বৃদ্ধি যেন ব্যাহত না হয় সেজন্য দিই সযত্ন পরিবেশ। একটুখানি অবহেলা আর অযত্ন পেলে এসব উচ্চ ফলনশীল জাতের ফলন যায় কমে। এছাড়া নতুন চাষাবাদ পদ্ধতিতে ফসলে রোগবালাই আর কীটপতঙ্গের আক্রমণ এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বিশাল এলাকা জুড়ে আধুনিক কৌলি সমরূপ (genetic uniform) জাতের আবাদ দ্রুত রোগবিস্তার আর কীটপতঙ্গের আক্রমণের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া প্রান্তিক অনুর্বর জমিতে আধুনিক জাতগুলোর ফলনতো একেবারেই হতাশ করা। এসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য বৈচিত্র্যময় ফসলের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে উদ্ভিদ প্রজননবিদগণকে কৌলি বৈচিত্র্যের (genetic diversity) উৎস হিসেবে ফিরে যেতে হয় ফসলের নানা স্তরের আত্মীয়দের কাছে। বুনো আত্মীয়দের কদর কিন্তু এজন্যই অনেক বেশী। বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য তাই বিজ্ঞানীরা এদের যত্ন করে সংরক্ষণ করছেন জিন ব্যাংকে। এখন যারা রয়ে গেছে সংগ্রহের বাইরে এদের সংগ্রহ করে নেবার পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের।

বুনো প্রজাতি উদ্ভিদ প্রজননবিদদের কাছে খুব মূল্যবান সম্পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে সচরাচর এদের ব্যবহার করা হয় শেষ সম্বল হিসেবে। বুনো প্রজাতিদের চেনা এবং ফসলের সঙ্গে এদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা নির্ধারণ সহজ কাজ নয়। আমাদের ফসল নানা বৈশিষ্ট্য গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে এতোটাই ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে যে এদের দেখে বুনো আত্মীয়দের চেনা বেশ কষ্টকর। বহুক্ষেত্রে তা অসম্ভবও বটে। তাছাড়া দীর্ঘ প্রাকৃতিক বিবর্তন বুনো প্রজাতির মধ্যেও ঘটিয়েছে নানা রূপান্তর। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে নানা উদ্ভিদ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ফসলের সঙ্গে এদের সংকরায়ন আর সংকর উদ্ভিদের কোষতাত্ত্বিক আর অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য ও এর

উর্বরতা অনুর্বরতা পর্যবেক্ষণ করেই চেনা সম্ভব ফসলের বুনো আত্মীয়দের। তাছাড়া বুনো প্রজাতির রয়েছে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য যা আমাদের ফসলে কখনও কাম্য নয়। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অপসারণ করে ফসলে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সংযোজনও কম ঝামেলার কাজ নয়। কিন্তু ফসলের ঘনিষ্ট সম্পর্কিত কৌলি সম্পদ ঘেটে যখন কোন কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলবে না তখন বুনো আত্মীয়দের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়ে আসা ছাড়া আর কোন বিকল্পও থাকে না।

বুনো আত্মীয়দের বৈশিষ্ট্য ফসলে স্থানান্তরের কাজটি যে খুব সহজ নয় তা একটু আগেই বলেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে তা রীতিমত কঠিন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আবার প্রচলিত ফসল উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর একেবারে অসম্ভবও বটে। বুনো আর আবাদি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি সমান হয় এবং এদের সংকরায়নের মাধ্যমে যদি উর্বর সংকর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভবপর হয় তাহলে সংকরায়ন আর পশ্চাৎ সংকরায়ন (back crossing) পদ্ধতি অনুসরণ করে বুনো প্রজাতি থেকে আবাদি প্রজাতিতে জিন স্থানান্তর বেশ সহজ হয়। বহু ক্ষেত্রে অবশ্য সংকর বীজ পাওয়াই হয়ে পড়ে দুষ্কর। পরাগরেণুর গর্ভমুণ্ডে অংকুরিত হওয়া থেকে শুরু করে নিষেক সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার যে কোন স্থানে বিঘ্ন ঘটলেই ব্যর্থ হতে পারে সংকরায়ন। সেক্ষেত্রে নানা গবেষণায় জানতে হয় সত্যিকার বাঁধাটা কোথায়। কখনো গর্ভদণ্ড ছেঁটে দিয়ে বা পরাগরেণু সরাসরি ভ্রুণস্থলিতে প্রবেশ করিয়ে বা অন্য কোন বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে বিঘ্ন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সমস্যা দেখা দিতে পারে সংকর ভ্রুণ তৈরি হওয়ার পরও। ভ্রুণ খাদ্য পায় সস্য বা আন্তঃশাঁস (endosperm) থেকে। সস্য তৈরি না হলে কিংবা অস্বাভাবিক সস্য তৈরি হলেও ভ্রুণে খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত না হলে ভ্রুণ অকালেই ঝরে পড়ে। আজকাল অবশ্য কোষ কলা আবাদ (tissue culture) কৌশল উন্নত হওয়ায় ভ্রুণ আবাদের মাধ্যমে এসব সংকর ভ্রুণ উদ্ভিদে পরিণত হতে পারছে।

দূর সম্পর্কিত প্রজাতিসমূহের মধ্যে সংকরায়ন করে সাফল্য পাবার আর একটি বাঁধা হলো দু'টি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার ভিন্নতা। কখনো আবার ভিন্নতা থাকে প্লয়েডি স্তরে কিংবা মৌল (basic) ক্রোমোজোম সংখ্যায়। অহ্রাসকৃত (unreduced) জনন কোষ সৃষ্টি করে ডিপ্লয়েড আর টেট্রাপ্লয়েড প্রজাতির মধ্যে সহজেই সংকরায়ন করা সম্ভব। অহ্রাসকৃত জনন কোষ বলতে ডিপ্লয়েড প্রজাতির থেকে অনিয়মিত মিয়োসিস সংঘটিত হওয়ায় হ্যাপ্লয়ডের পরিবর্তে ডিপ্লয়েড জনন কোষ পাওয়াকে বুঝায়। অতঃপর টেট্রাপ্লয়েড প্রজাতির ডিপ্লয়েড জননকোষের সঙ্গে ডিপ্লয়েড প্রজাতির অহ্রাসকৃত ডিপ্লয়েড জনন কোষের মিলন ঘটিয়ে পাওয়া সম্ভব

উর্বর সংকর উদ্ভিদ। গোলআলুতে এভাবে ডিপ্লয়েড প্রজাতি থেকে ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী আর সিস্ট নেমাটোড প্রতিরোধী জিন স্থানান্তর সম্ভবপর হয়েছে আবাদির প্রজাতিতে।

বুনো প্রজাতি ডিপ্লয়েড আর আবাদি প্রজাতি টেট্রাপ্লয়েড হলে বুনো প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা কলচিসিন প্রয়োগ করে দ্বিগুণ করে নিয়ে আবাদি প্রজাতির সঙ্গে সংকরায়ন করা সম্ভব। আলফা আলফা ঘাস ফসলে এভাবে বুনো বহুবর্ষজীবী প্রজাতির বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। সেতু প্রজাতি (bridge species) ব্যবহার করেও কখনো কখনো প্লয়েডি স্তর অতিক্রম করে জিন স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। সেতু প্রজাতি হিসেবে যে প্রজাতিটি ব্যবহৃত হয় তা বুনো প্রজাতি এবং আবাদি প্রজাতি উভয়টির সাথেই সংকরায়নে সক্ষম। এক্ষেত্রে বুনো প্রজাতি থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যটি প্রথম নেওয়া হয় সংকরায়ন করে সেতু প্রজাতি হিসেবে যে প্রজাতিটি ব্যবহার করা হয় তাতে এবং পরবর্তীতে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত সেতু প্রজাতির সাথে সংকরায়ন করা হয় আবাদি প্রজাতিটির। এভাবে তৃতীয় প্রজাতির মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য বুনো প্রজাতি থেকে নিয়ে নেওয়া হয় আবাদি প্রজাতিতে। এরকম সেতু প্রজাতি হিসেবে টেট্রাপ্লয়েড ডিউরাম গমকে ব্যবহার করে বুনো ঘাস থেকে আইস্পট (eyespot) রোগ প্রতিরোধী জিন হেক্সাপ্লয়েড গমে স্থানান্তর করা হয়েছে। এমনকি একটি বুনো ঘাস *Aegilops speltoides*-কে সেতু হিসেবে ব্যবহার করে অন্য একটি বুনো ঘাস *A. comosa* থেকে হলুদ মরিচা পড়া (Yellow rust) রোগ প্রতিরোধী জিন আবাদি জাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কিরণপাতকরণের (irradiation) মাধ্যমেও কখনো কখনো দূর সম্পর্কিতদের মধ্যে সংকরায়ন করে জিন স্থানান্তর সম্ভব। দু'টি প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ন করে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদে কিরণপাত করলে ক্রোমোজোমের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হলে তৈরি হতে পারে নতুন জিন সংযোগ। গমের এক বুনো আত্মীয় *Aegilops umbellata* পাতার মরিচা পড়া রোগ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য এভাবে সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে আবাদি গমে।

কেবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই নয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু বৈশিষ্ট্যও বুনো আত্মীয় প্রজাতি থেকে ফসলে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি প্রজননবিদের প্রধানতম লক্ষ্যের একটি। এক্ষেত্রেও বুনো প্রজাতির গুরুত্ব অপরিসীম। ইকোয়েডর আর পেরুতে একটি বুনো টমেটো প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে যার রয়েছে পাঁচ পাঁচটি অনিষ্টকর কীট প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। এ টমেটো প্রজাতিটির রয়েছে এক প্রকার তীব্র তিক্ত গন্ধ নিঃসরণ করার মতো কতগুলো গ্রন্থি যা

কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে গাছকে বিরত রাখে। এর প্রতিরোধী জিন স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। গোলআলুতে বুনো প্রজাতির কীট প্রতিরোধী জিন স্থানান্তর করে নেদারল্যাণ্ড আর জার্মানীতে অবমুক্ত করা হয়েছে এগারটি আধুনিক জাত। হিম প্রতিরোধ ক্ষমতা (frost resistance) অর্জন করেছে কোন কোন টমেটো জাত বুনো প্রজাতি থেকে। আঙ্গুর, স্ট্রবেরী, গম, রাই আর পেঁয়াজে বুনো প্রজাতির শীত সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্যটি স্থানান্তর করা হয়েছে ইতোমধ্যে। এমনকি খরা সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্যটিও বুনো প্রজাতি থেকে অর্জন করেছে আবাদি মটর আর গম।

অনেক বুনো প্রজাতির রয়েছে অধিক আমিষ উৎপাদন ক্ষমতা। কাসাবার দু'টো বুনো প্রজাতির সঙ্গে সংকরায়নের মাধ্যমে কোন কোন জাত পেয়েছে এ বৈশিষ্ট্যটি। বুনো গম *Agropyron glaucum*-এর আমিষ উপাদান স্থানান্তরের জন্য রাশিয়াতে আবাদি গমের সঙ্গে সংকরায়ন করানো হয়েছে সেই পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকেই। বুনো তুলার শক্ত তন্তুর বৈশিষ্ট্য আবাদি তুলায় স্থানান্তর করে আবাদি তুলার শক্ত আঁশ উৎপাদন, বুনো পামের খর্বাকৃতির বৈশিষ্ট্যটি আফ্রিকার আবাদি অয়েল পামে সংযোজন করে আবাদি পামের উচ্চতা হ্রাস, বুনো ধান থেকে সাইটোপ্লাজমীয় পুং বন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যটি ধানের জাতে স্থানান্তর করে হাইব্রিড ধান উৎপাদন ইত্যাদি কতো রকম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহই অনাবাদি জাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আমাদের দেশেও জিন ব্যাংকগুলোতে সংরক্ষণ করা হয়েছে ফসলের নানা স্তরের আত্মীয় স্বজনের কৌলি সম্পদ। এদেরও এমন বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এক সময় আমাদের আবাদি জাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে। এর জন্য প্রয়োজন সংরক্ষিত বুনো প্রজাতির মূল্যায়ন আর বৈশিষ্ট্যায়ন সম্পন্ন করা। জানা দরকার ফসলের সঙ্গে কোনটির সম্পর্কের দূরত্ব কতোটা। পাশাপাশি এখনও যেসব বুনো প্রজাতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি তাদের অনতিবিলম্বে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা উচিত। আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে আজকের অবহেলায় যে বুনো প্রজাতিটি হারাবো একদিন মহাপ্রয়োজনের সময় তার হয়তো দেখাই মিলবে না।

আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ব্যবহার করে যে কোন জীবের জিনই ফসলে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। আর তাতে পাওয়া যাচ্ছে নানা রকম ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ। সেসব কোন কোন উদ্ভিদ থেকে বাছাই করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে ট্রান্সজেনিক ফসল। বুনো কৌলি সম্পদের জিন এতদিন সচরাচর ফসলে স্থানান্তর করা সম্ভব

হতো। এখন জিন প্রযুক্তির সুবাদে যে কোন বুনো প্রজাতির কাঙ্ক্ষিত জিন ফসলে সংযোজন করে দিয়ে পাওয়া সম্ভব নতুন রকম ফসলের জাত।

জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে আবাদী গোল আলুতে সংযোজন করা হয়েছে বুনো গোল আলু প্রজাতির জিন। আবাদী গোল আলু প্রজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু হলো বিলম্বিত ধ্বসা রোগ, ইংরেজীতে একে বলো late blight of potato। *Phytophthora infestans* নামক এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণ ঘটলে এ রোগটির সৃষ্টি হয় এবং তা গোল আলুর ফলন কমিয়ে দেয় ভীষণ রকম। গোল আলুর বুনো প্রজাতি থেকে RB (Resistance Blight) জিন সংযোজন করা হয় আবাদী আলুর দু'টি জাতে। এসব ট্রান্সজেনিক গোল আলু উদ্ভিদ নিয়ে আমাদের দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএআরআই) চলছে যাচাই বাছাই কর্মকাণ্ড। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, RB জিন সমৃদ্ধ গোল আলু গাছগুলো বিলম্বিত ধ্বসা রোগ ভালই প্রতিরোধ করতে পারছে। এখন রোগ সহিষ্ণুতা যাচাই করার পাশাপাশি চলছে এদের ফলনশীলতা কেমন সেসব যাচাইয়ের কাজও। এক সময় এসব ট্রান্সজেনিক গাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে ট্রান্সজেনিক বিলম্বিত ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী আলুর জাত।

শতবর্ষের ফসল উন্নয়ন ধারা

মানুষ ফসলের আবাদের কাজটি শুরু করেছে এখন থেকে নয়-দশ হাজার বছর পূর্বে। আর আমাদের দেশে ফসলের আবাদ শুরু হয়েছে কম করে হলেও চার হাজার বছর পূর্বে। এর সিংহভাগ সময় ধরেই নানা রকম ফসল আহরণ আর ফসলের নানা রকম জাত সৃষ্টি করেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা। তাদের ফসলের মাঠ ছিল ভীষণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানা রকম ফসলের পাশাপাশি এক একটি ফসলের কত রকম জাতই না তারা আবাদ করতো। সে সময়ের কৃষকের মাঠ ছিল নানা রকম ফসল আর ফসলের জাতের এক একটি জীবন্ত যাদুঘর। গত শতাব্দীর আগেও আমাদের দেশের ফসলের জাতের নির্মাতা ছিলেন মূলত কৃষকগণই।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই গ্রেগর যোহান মেন্ডেলের যুগান্তকারী বংশগতির সূত্র দু'টি পুনরাবিস্কৃত হয়। পিতা-মাতার নিকট থেকে কীভাবে জিনের মাধ্যমে সন্তানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয় সে রহস্য উন্মোচিত হয়। ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় এর ফলে। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবিত হতে থাকে নতুন নতুন ফসল উন্নয়ন পদ্ধতিসমূহ। উদ্ভাবিত হতে থাকে ফসলের নতুন নতুন জাতসমূহ।

গত শতাব্দীর শুরুতে অবশ্য ফসলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাতগুলো সংগ্রহ করে একত্রে সংরক্ষণ করাই ছিল মূল কাজ। একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হয়। একদিকে, এর ফলে নানা বৈচিত্র্যময় জাত একসঙ্গে সংরক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অন্য দিকে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এসব জাতের মধ্যে যেগুলো সর্বোত্তম সেগুলোর বীজ বর্ধন করে চাষাবাদের জন্য কৃষকের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট জাতের আবাদ ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হল। ফসলের নানা রকম জাত সংগ্রহ এবং এদের ফসল পরীক্ষার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানীগণের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তখন।

সব ফসলেই এতদিন কিন্তু মিশ্র প্রকৃতির ফসলের জাতই আবাদ করতেন কৃষকগণ। নানা রকম জিনের মিশেল থাকায় ঐ জাতগুলো আজকের মতো সমরূপ প্রকৃতির ছিল না। এদের ফলনও ছিল তুলনামূলকভাবে কোন কোন ফসলে বেশ কম। ধানের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কৃষক কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব জাতের ফলন ছিল গড়ে হেক্টর প্রতি ২.০ টন বা কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়ে কিছুটা বেশি। তবে স্বাদে গন্ধে

আর গুণে মানে এরা ছিল অনন্য। ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে শুরু করলো। দেশের প্রয়োজনের নিরীখে বিজ্ঞানীগণও সে লক্ষ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেন।

আগেই বলেছি যে, কৃষকের উদ্ভাবিত জাতগুলো ছিল মিশ্র প্রকৃতির। এসব জাতের বিভিন্ন লাইনগুলোর ভূমিকা ছিল কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কোন কোনটার ফলনশীলতা অন্যটির তুলনায় অধিক ছিল। বিজ্ঞানীগণ এসব মিশ্র জাত থেকে উচ্চ ফলনশীল লাইনগুলোকে আলাদা করে নেবার কথা ভাবলেন। সেভাবেই নির্বাচন কর্মটিও সারলেন তারা। অল্প কিছুদিন পরই তারা নির্মাণ করতে সক্ষম হলেন অধিক ফলনশীল নতুন জাত। আমাদের দেশে অমিশ্রিত এবং সমরূপ এসব জাত ধানের ক্ষেত্রে প্রথম উদ্ভাবিত হয় ১৯২০ সালে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত।

ষাটের দশকে এসে ধান এবং গম উন্নয়নে খর্বাকৃতি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন সংযোজন ফসল উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা নিয়ে এলো। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) এর বিজ্ঞানীগণ তাইওয়ানের কৃষকদের কর্তৃক নির্বাচিত ও আবাদকৃত খর্বাকৃতির একটি ধান জাত- Dee-Gee-Woo-Gen থেকে খর্বাকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন স্থানীয় জাতের ধানে স্থানান্তর করতে সক্ষম হলেন। ফলে, উদ্ভাবিত হলো খর্বাকৃতি স্বভাবের উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত IR-8। অধিক সার প্রয়োগেও এ জাতটি নেতিয়ে পড়তো না। নেতিয়ে পড়া পাতার পরিবর্তে এর পাতা হলো খাড়া প্রকৃতির ও কিছুটা তির্যক। ফলে সূর্যের আলোর উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হলো। ফলশ্রুতিতে বেড়ে গেলো এই জাতটির কর্তনাংক (harvest index)। এ জাতটি আমাদের দেশে আমদানি করা হয় ষাটের দশকে। ইরি-এর খর্বাকৃতির জাতের সঙ্গে সংকরায়ন করে আমাদের বিজ্ঞানীগণ তৈরি করেন খর্বাকৃতির এবং পরবর্তীতে আধা-খর্বাকৃতির জাতের ধান। স্বাধীনতার পর পর এসব জাত অবমুক্ত হতে থাকে বাণিজ্যিকভাবে আবাদের লক্ষ্যে। গত তিন দশকে আমাদের দেশে গড়ে প্রতি বছর ধানের ফলন বেড়েছে শতকরা ২ ভাগ হারে। খর্বাকৃতির উচ্চ ফলনশীল ধান জাতের আবাদ এবং সার, সেচ ও উত্তম ব্যবস্থাপনা ধানের ফলন বাড়িয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। গত চার দশকে ৫৭টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে এদেশে আবাদের জন্য শুধু BRRI থেকে।

ষাটের দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল- জাপানের Norin 10 নামক খর্বাকৃতির গমের জাত থেকে CIMMYT কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতে খর্বাকৃতি স্বভাবের জন্য দায়ী জিন সংযোজন করা। খর্বাকৃতির জন্য দায়ী জিন প্রাপ্ত হওয়ায় এসব গমের জাতও অধিক সার ও সেচ সংবেদনশীল হতে পেড়েছে এবং এদের

পাতার বিন্যাস ও আকৃতি সূর্যের আলো অধিক কাজে লাগিয়ে ফলন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ষাটের দশকে এসব গম ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বহুদেশের মতো বাংলাদেশেও। যুক্তরাজ্যে এসব উচ্চ ফলনশীল জাত এতটা সফল হয়েছে যে, গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে গড়ে ফলন বেড়েছে শতকরা তিন ভাগ হারে। ফসলাকৃতির পরিবর্তন করে ফলন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে খর্বাকৃতির বাজরা ও জোয়ারের ক্ষেত্রেও।

ফসলের হাইব্রিড জাত তৈরি এবং বাণিজ্যিকভাবে এদের ব্যবহার কিন্তু শুরু হয়েছে ১৯২০ সালেই। যুক্তরাষ্ট্রে এসময় হাইব্রিড ভুট্টার জাত অবমুক্ত করা হয়। চারটি প্রজনক বা জাতের মধ্যে সংকরায়ন করে ডাবল ক্রস হাইব্রিড তৈরির মাধ্যমে ভুট্টার ফলন বেড়ে যায় শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি। হাইব্রিড জাত এসময় যুক্তরাষ্ট্রে এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সকল ভুট্টার আবাদ হয় হাইব্রিড জাত ব্যবহার করে। ১৯২০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে নানা রকম হাইব্রিড জাত সৃষ্টি এবং এদের ব্যবহার ফলন বৃদ্ধি করেছে চারগুণ। রাসায়নিক সারের ব্যবহার, বালাইনাশক প্রয়োগ এবং চাষাবাদের যান্ত্রিকীকরণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বটে তবে অনেকের মতে শতকরা ৬০-৭৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে শুধুমাত্র হাইব্রিড জাত ব্যবহারের ফলে।

হাইব্রিড ভুট্টার সাফল্য দেখে প্রজননবিদগণ অন্য ফসলেও হাইব্রিড জাত সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। সবজি ফসলের ক্ষেত্রে হাইব্রিড জাত সৃষ্টি ও এদের আবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। কুমড়া পরিবারের বিভিন্ন ফসল যেমন-শসা, মিষ্টি কুমড়া, তরমুজ, বাঙ্গি, লাউ, চিচিঙ্গা, করলা ইত্যাদি ফসলে পর-পরাগী বৈশিষ্ট্যসহ কোন কোনটার একলিঙ্গিক স্বভাব হাইব্রিড জাত সৃষ্টিকে আকর্ষণীয় করে তুলে। পৃথিবীর বহুদেশে তাদের উৎপাদিত সবজির সিংহভাগই আসে হাইব্রিড জাতের আবাদ থেকে। স্ব-পরাগী ফসলের মধ্যে ধানে হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করা হয় আশির দশকে। চীনে ধানের হাইব্রিড জাতের ব্যাপক সাফল্য দেখে ভারতেও বিজ্ঞানীগণ হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনে এগিয়ে আসেন। হাইব্রিড ধান ছাড়াও টমেটো এবং বেগুনের ক্ষেত্রেও হাইব্রিড জাত সৃষ্টি শুরু হয় তার বেশ কয়েক দশক পূর্ব থেকেই।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ফসলের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনের কাজ ভীষণ পিছিয়ে পড়ে সে তুলনায়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে ভারত ও চীন থেকে হাইব্রিড ধান আমদানি করা হয় আমাদের এখানে। কোন কোন হাইব্রিড ধানের জাত আমাদের পরিবেশে বেশ ভাল ফলন দিলেও কোন কোন হাইব্রিড জাত একেবারে বাজে ফলন দিয়েছে। ভিন্ন পরিবেশে উৎপাদিত হাইব্রিড জাত আমাদের পরিবেশে উত্তম ফলন

দিবে এটা আশা করা আমাদের ঠিক হয়নি। কৃষকের মাঠে সে সময় হাইব্রিডের ফলন বিপর্যয় কৃষকের মনে হাইব্রিড সম্পর্কে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আমাদের দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে সবজি গবেষণার সঙ্গে উদ্যানতত্ত্ববিদরা জড়িত। সবজির চমৎকার লিঙ্গ ভিন্নতার স্বভাবটি কাজে লাগিয়ে তারা হাইব্রিড জাত তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদ্ভিদ প্রজননবিদরা সবজি ফসল নিয়ে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পেলে বাংলাদেশে হাইব্রিড জাত সৃষ্টি ও ব্যবহার নিশ্চিত করে সবজির ফলন বৃদ্ধি করা যে সম্ভব তার জ্বলন্ত প্রমাণ বেসরকারী বীজ কোম্পানী লাল তীর সীড কোঃ লিঃ এর প্রজননবিদদের সাফল্য। গত দশ পনের বছরে বেশ ক'টি সবজি ফসলের হাইব্রিড জাত এ সংস্থাটি উদ্ভাবন করছে যা কৃষকের নিকট বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ষাটের দশকে বিজ্ঞানীগণ নানা রকম রশ্মি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে নতুন ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবন করেন। সে সময় অবশ্য কৃত্রিমভাবে ফসলে বিভিন্নতা সৃষ্টির এ নতুন উপায়টি ফসলের উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করবে বলে মনে করা হয়েছিল। অধিকাংশ মিউট্যান্ট উদ্ভিদের প্রকৃত উপযোগিতা না থাকায় এ বিষয়টি নিয়ে আগ্রহের কিছুটা ভাটা পড়ে পৃথিবীর অনেক দেশে। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকার ভৌত ও রাসায়নিক মিউটাজেন প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফসলে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করছেন বিজ্ঞানীগণ। যেসব ফসলে কৌলিসম্পদের ভিত্তি প্রশস্ত নয় এবং যে সব ফসলে জিন যুথবদ্ধ (linked) অবস্থায় থাকায় উন্নয়ন ব্যাহত হয় সেসব ক্ষেত্রে মিউটেশন প্রজনন একটি চমৎকার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফসলের ক্রোমোজোম সংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে ফসল উন্নয়ন করার কর্মকাণ্ডও শুরু হয় ত্রিশের দশক থেকেই। কলচিসিন নামক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করার উপায় আবিস্কৃত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা ফসল উন্নয়নে এর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করেছিলেন। বাস্তবে কিন্তু, এতোটা সাফল্য অর্জিত হয়নি এর ফলে। তবে ফসলের দূর সম্পর্কিতদের সঙ্গে ক্রসিং-এর ক্ষেত্রে শংকর উদ্ভিদে উর্বরতা আনয়নের লক্ষ্যে ক্রোমোজোম দ্বিগুণিত করার কৌশল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্বিগুণিত হাইব্রিডকে 'সেতু' হিসেবে ব্যবহার করে দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে আবাদি ফসলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। গম ও সরিষা ফসলে কৃত্রিমভাবে আবাদি প্রজাতির মত বহুগুণিতক (polyploid) প্রজাতির পুনঃসংশ্লেষণ নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাত সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। এভাবে *Brassica napus* প্রজাতিটির পুনঃসংশ্লেষণ করায় তা এখন আমাদের পরিবেশে জন্মানো সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া ক্রোমোজোম

সংখ্যা বৃদ্ধি করার কৌশল প্রয়োগ করে গম এবং রাই ফসলের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি নতুন ফসল ট্রিটিক্যাল। বহুগুণিতকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক বুনো প্রজাতি থেকে সংকরায়ন ও পশ্চাৎ সংকরায়ন করে আমাদের ফসলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে।

চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে টিস্যু কালচার কৌশল আবিস্কৃত হবার পর ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা অবদান রাখতে শুরু করে। অল্প স্থানে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গজ অংশ কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে আবাদ করার ফলে অঙ্গজ উপায়ে উদ্ভিদের গুণাগুণ অপরিবর্তিত রেখে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলে এ কৌশল অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে কলা, পেঁপে, কাঁঠাল ইত্যাদি ফসলের প্রচুর সংখ্যক গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। আমাদের দেশে গোলআলুর টিস্যু কালচার করে রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক ভাবে অনেক দিন ধরেই। রোগমুক্ত ফসলের চারা উৎপাদনে টিস্যু কালচার বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উদ্ভিদের মেরিস্টেম আবাদ করে ভাইরাসমুক্ত ফসল উৎপাদন কোন কোন ফসলে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভ্রুণ আবাদ কৌশল এখন দূর সম্পর্কিত উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের মধ্যকার সংকর উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। গত তিন দশকের কৌলি সম্পদ সংগ্রহ অভিযানের ফলে বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক কৌলি সম্পদ সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও স্থানীয়ভাবে জাতীয় পর্যায়ের জিন ব্যাংকগুলোতে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে বহু ফসলের কাছের দূরের নানা স্তরের কৌলি সম্পদসমূহ। টিস্যু কালচার কৌশল ও ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করার কৌশলের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে ফসলের নানা স্তরের কৌলি সম্পদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ফসলে স্থানান্তর করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া পরাগরেণুর আবাদ কৌশল ফসল উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ নিয়ে এসেছে। টিস্যু কালচার করে ফসলে যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় তা থেকে যাচাই বাছাই করে কোন কোন ফসলে নতুন নতুন জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভিদের কোষস্থ প্রাচীর সরিয়ে নিয়ে প্রোটোপ্লাষ্ট আবাদ করে গোল আলু এবং ইক্ষু ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাতসহ বেশ কিছু উচ্চ ফলনশীল জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান এখন টিস্যু কালচার করে ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। অর্কিডসহ বহু ফুল ফসলে টিস্যু কালচার একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। টিস্যু কালচার গবেষণা সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হলে আমাদের কৃষিতে এর ইতিবাচক সাফল্য যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গত তিন দশকে

টিস্যু কালচার কৌশলসমূহ এতোটাই উন্নত করা সম্ভব হয়েছে যে, বিদেশের বহু কোম্পানী টিস্যু কালচার ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করে প্রচুর আয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।

বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিক ১৯৫৩ সালে এসে জিন তথা DNA এর ভৌত রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি আবিস্কার করেন। ধীরে ধীরে DNA, RNA ও প্রোটিনের ক্রিয়া-কর্ম এবং তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীগণ দিতে সক্ষম হন। সত্তর-এর দশকে এসে আণবিক বংশগতিবিদ্যা নামে বংশগতিবিদ্যার আর একটি শাখা সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীগণের নিরন্তর গবেষণার ফলশ্রুতিতে আণবিক কৃৎ-কৌশল উন্নত থেকে উন্নততর হয়। আশির দশকে এসে নানা রকম এনজাইমকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট জিন শনাক্ত করে তা কর্তন করা, নির্দিষ্ট স্থানে জিনটিকে সংযুক্ত করা এবং জিনটির উৎপাদ (Product) সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। যাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজী বলা হয়। এরই আরেক নাম-জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এ কৌশলটি মানুষের হাতে আসায় উদ্ভিদ প্রজননবিদদের অনেক দিনের লালিত একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। প্রচলিত ফসল উন্নয়ন কর্মধারায় কেবলমাত্র যে সব উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতিসমূহের মধ্যে সংকরায়ন করা সম্ভব হয় তাদের মধ্যে জিন বিনিময় করা যেতো। তাছাড়া কেবলমাত্র একটি জিন ফসলে সংযোজন করা প্রায়শই সম্ভব হতো না। যুথবদ্ধতার কারণে বহু জিন একসঙ্গে ফসলে চলে আসতো। তাতে কাঙ্ক্ষিত জিনের সঙ্গে একটি দু'টি অনাকাঙ্ক্ষিত জিনও ফসলে চলে আসতো এবং কখনো কখনো জিন স্থানান্তরের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল আবিস্কৃত হওয়ায় প্রজননবিদদের হাতে অনেকগুলো বাড়িত সুযোগ চলে এসেছে।

এখন একাধিক জিন নয় বরং একটি সুনির্দিষ্ট জিন কর্তন করে ফসলে সংযোজন করা যাচ্ছে। যেসব উদ্ভিদ প্রজাতির সঙ্গে আমাদের ফসলের এতোদিন সংকরায়ন করা সম্ভব হয়নি তাদের জিনও অনায়াসে কর্তন করে দিয়ে ফসলে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। কেবল ফসলের বিভিন্ন প্রজাতি নয় বরং অন্য প্রাণী বা অণুজীব অর্থাৎ যে কোন উৎস থেকে জিন কর্তন করে এখন ফসলে সংযোজন করে দিয়ে প্রত্যাশিত ফল লাভ করা যাচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে নানা ফসলের জেনেটিক্যালি মডিফাইড জাত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কীট প্রতিরোধী, আগাছানাশক প্রতিরোধী এবং নানা রকম রোগ প্রতিরোধী জাতগুলো। রোগ-বালাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৈরি করা হচ্ছে ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবার আর কোন কার্যকর বিকল্প না থাকায় ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ফসলের জাত সৃষ্টির জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বেশ সাড়া

জাগিয়েছে। এছাড়াও ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রযুক্তি এখন ফসল উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। নব্বই-এর দশক থেকেই বাণিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে ট্রান্সজেনিক বা জি এম সয়াবিন, তুলা, ভুট্টা, টমেটো, গোলআলু ইত্যাদির জাত। বাজারজাত করবার অপেক্ষায় রয়েছে আরও কতো জাত।

আমাদের দেশে এখনও কোন ফসলেই ট্রান্সজেনিক জাত উৎপন্ন করা সম্ভব হয়নি। এদেশে এখনও বাইরে থেকে আমদানী করে কোন ট্রান্সজেনিক ফসলের আবাদ শুরু হয়নি। ট্রান্সজেনিক তথা জি এম ফসলের আবাদ এবং এদের ব্যবহার নিয়ে পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও নানা তর্ক-বিতর্ক চলছে। আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা একটি কার্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব। ততোদিন নানা উৎস থেকে জিন আহরণ করে তা আমাদের ফসলে সংযোজন করে দিয়ে ট্রান্সজেনিক ফসলের বহুমাত্রিক ব্যবহার শুরু হবে এমনটি অনুমান করা চলে।

১৯০০ সালে সেই বংশগতির সূত্র দু'টির মধ্য দিয়ে যে রহস্যের জাল উন্মোচিত হতে থাকে গত এক শত বৎসরে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। জিন, জিনের গঠন এবং এর কার্যাবলী আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। জিন ক্রিয়া, জিন আন্তঃক্রিয়া এবং পরিবেশের সঙ্গে এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয়গুলো নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে পরিমাপ করতে শিখেছেন বিজ্ঞানীগণ। ফসল উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে জীবমিতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে উদ্ভিদ প্রজননবিদেরা বিভিন্নতাসম্পন্ন উদ্ভিদকূল থেকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ নির্বাচন করে নেবার জন্য উদ্ভাবন করেছেন নানা রকম কার্যকর ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি। আর এদের সার্থক প্রয়োগ নিশ্চিত করে তৈরি করেছেন নানা রকম ফসলের জাত। ফসল উন্নয়নের এ ধারাটি চলেছে বলেই একবিংশ শতাব্দীতে পা রেখেছি আমরা ম্যালথাসের হতাশাবাদকে পিছনে ফেলে। মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেবার এ কঠিন দায়িত্বটি পালন করা ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই বিজ্ঞানীগণের। সে লক্ষ্যেই চলবে বিজ্ঞানীগণের আগামী দিনের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আমরা এটাই প্রত্যাশা করি।

২

ট্রিটিক্যাল

মানুষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ফসল উন্নয়নের কাজে লিপ্ত হয় আজ থেকে ন'দশ হাজার বছর আগে। এরপর থেকে আজ অবধি চলছে তার ফসল উন্নয়ন প্রচেষ্টা। ইতোমধ্যে বহু বুনো উদ্ভিদকে সে নিয়ে এসেছে আবাদী পর্যায়ে। সৃষ্টি করেছে বহু ফসলের নানা জাত। ফসলের নানা জাতের মধ্যে পরাগ বিনিময় করে বার বার চাহিদা মাফিক পাল্টেছে ফসলের অবয়ব। সৃষ্টি করা হয়েছে বহু ফসলের একাধিক উন্নত জাত। বেড়েছে ফসলের ফলন, বেড়েছে উৎপাদিত ফসলের গুণগত মানও। কিন্তু কেবল উন্নত এবং উচ্চ ফলনশীল জাত সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি মানুষের আকাঙ্ক্ষা। এক ফসলে সে একত্রিত করতে চেয়েছে একাধিক ফসলের বৈশিষ্ট্য। তাই সে ঘটিয়েছে এক প্রজাতির উদ্ভিদের সঙ্গে অন্য প্রজাতির উদ্ভিদের সংকরায়ন, মিলন ঘটিয়েছে এক গণের উদ্ভিদের সঙ্গে অন্য গণের। দু'টি ভিন্ন গণের উদ্ভিদের মিলনেরই ফসল হল-ট্রিটিক্যাল। এটি মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি সার্থক নতুন ফসল।

গম এবং রাই দু'টি ফসলই Gramineae বা Poaceae পরিবারের ফসল। দু'টি ফসলেরই আছে বহু সংখ্যক প্রজাতি। আবাদী গম ও রাই-এর বৈজ্ঞানিক নাম হল যথাক্রমে-*Triticum aestivum* এবং *Secale cereale*। গম আমাদের অতি পরিচিত একটি দানা শস্য। রাইও মূলত একটি দানা শস্য। রুটি, বিস্কুট, আর ষ্টার্চ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এর দানা। তবে পৃথিবীর বেশ কিছু স্থানে গো মহিষাদির খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয় রাই গাছ। উত্তর ও পূর্ব ইউরোপে আর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় রাই একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্য। উর্বর মাটিতে উত্তম ব্যবস্থাপনায় গমের ফলন বেশ ভাল, এর আমিষের পরিমাণ মন্দ নয়, রুটি বানানোর জন্য এর আটা খুবই উপযোগী। এ গুণাবলীগুলো রাই ফসলের নেই। কিন্তু গম ফসল খরা বা অধিক শীত সহিষ্ণু নয়, অনুর্বর মাটিতে এদের অভিযোজন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নয় এবং মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমিনো এসিড-লাইসিনের পরিমাণ গমে খুবই কম। কিন্তু রাই ফসল এসব ক'টি গুণে সমৃদ্ধ। দু'টি ভিন্ন গণের এ দু'টি ফসলের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটিয়ে একটি নতুন ফসল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এদের মধ্যে ঘটানো হয় মিলন।

স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী এ এস উইলসন প্রথম গম এবং রাই ফসল দু'টোর মধ্যে সংকরায়ন করেন ১৮৭৫ সনে। তবে তা থেকে কোন উর্বর হাইব্রিড পাওয়া গিয়েছিল কিনা সে তথ্য জানা যায়নি। তবে গম এবং রাই ফসলের মধ্যে সংকরায়ন করে হাইব্রিড উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিতকরণের মাধ্যমে উর্বর হাইব্রিড উদ্ভাবনে সক্ষম হন ডব্লিউ রিমপাউ ১৮৮৮ সনে। প্রকৃতিতেও গম এবং রাই ফসলের মধ্যে পর-পরাগায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে হাইব্রিড উদ্ভিদ। পরবর্তী ষোল বছর ধরে এসব হাইব্রিড উদ্ভিদ থেকে নতুন ফসল বাছাই করে নেবার কাজ চালিয়ে যান বিজ্ঞানী সেয়িস্টার এবং তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীগণ। এরপর বহুবার নানা প্রস্থি (Ploidy)-এর গমে আর রাই-এ সংকরায়ন করে তৈরি করা হয়েছে নানা রকম ট্রিটিক্যাল। Triticum গণের Triti আর Secale গণের Cale এ দু'টি অংশ মিলে এর নামকরণ করা হয়েছে Triticale। Triticale শব্দটি প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকায় ব্যবহার করেন আর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরমার্ক। মেণ্ডেলের বংশগতির সূত্র দু'টি পুনরাবিষ্কারের জন্য তিনি সমধিক পরিচিত। ১৯৩৫ সন থেকে Triticale নিয়ে এক দীর্ঘ গবেষণার সূত্রপাত করেন সুইডেনের আর এক বিজ্ঞানী আরনি মুজিং। বলতে গেলে সারা জীবন এই নতুন ফসল নিয়ে গবেষণা করে কাটিয়েছেন তিনি।

এ যাবত সৃষ্টি করা হয়েছে তিন রকমের ট্রিটিক্যাল- ষষ্ঠপ্রস্থি, অষ্টপ্রস্থি আর চর্তুপ্রস্থি ট্রিটিক্যাল। ষষ্ঠপ্রস্থি ট্রিটিক্যাল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের আবাদি গমের নিকট আত্মীয় চর্তুপ্রস্থি গম আর দ্বিপ্রস্থি রাই। এদের ত্রিপ্রস্থি সংকর উদ্ভিদ অনুর্বর হওয়ায় এদের ক্রোমোজম সংখ্যা দ্বিগুণ করে তৈরি করা হয়েছে ষষ্ঠপ্রস্থি ট্রিটিক্যাল। অষ্টপ্রস্থি ট্রিটিক্যাল এসেছে আবাদী ষষ্ঠ প্রস্থি গম আর দ্বিপ্রস্থি রাই-এর সংকর উদ্ভিদের ক্রোমোজম সংখ্যা দ্বিগুণ করে। চর্তুপ্রস্থি ট্রিটিক্যাল এসেছে দ্বিপ্রস্থি গম আর দ্বিপ্রস্থি রাই থেকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত ট্রিটিক্যালের উর্বরতা ছিল নিম্নমানের। বীজ ছিল কুঁচকানো। বীজের সংখ্যা ছিল কম। একই শীষে দানার আকৃতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন রকম। গুণগত মানও ছিল অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় কথা ফসল কর্তনের পূর্বে ফসল সংগ্রহের মৌসুমে আর্দ্র পরিবেশ পেলে শীষে লেগে থাকা অবস্থায় বীজ ফুঁড়ে বের হতো অংকুর। সে সময় একটি উন্নত জাতের গমের তুলনায় এর ফলন ছিল মাত্র অর্ধেক। প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রিটিক্যালের এসব সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের জন্য বিগত ৫০ বছর ধরে পৃথিবীর নানা দেশে গবেষণা কাজ চলেছে নিরন্তর। সৃষ্টি করা হয়েছে নানা স্তরের ট্রিটিক্যাল। এদের মধ্যে অধিক উর্বরতা আর কোষতাত্ত্বিক স্থায়ীত্বের জন্য ষষ্ঠপ্রস্থি ট্রিটিক্যাল অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার জন্য ষষ্ঠপ্রস্থি ট্রিটিক্যাল নিয়ে চলেছে ব্যাপক গবেষণা। একে সংকরায়ন করা হয়েছে গমের নানা বংশধরের উদ্ভিদের সঙ্গে, আন্তঃ সংকরায়ন করা হয়েছে নানা প্রস্থির

ট্রিটিক্যালের সঙ্গে আর পশ্চাৎ সংকরায়ন করা হয়েছে নানা জাতের গমের সঙ্গে। এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রিটিক্যাল। প্রাথমিক পর্যায়ের ট্রিটিক্যালের প্রায় সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে দ্বিতীয় স্তরের ট্রিটিক্যাল পরিণত হয়েছে এক উন্নত নতুন ফসলে। এর বীজের কর্তনপূর্ব অঙ্কুরোদগম বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, দানার কুঁচকে যাওয়া স্বভাব অনেকটাই পাল্টেছে, বেড়েছে উর্বরতা, বীজের সংখ্যা এবং অনিবার্যভাবে বেড়েছে ফলন। বর্তমান সময়ের ট্রিটিক্যালের ফলন উন্নত গম জাতের অনুরূপ। ১৯৬৪ সনে মেক্সিকোর CIMMYT-এ শুরু হয়ে ট্রিটিক্যাল নিয়ে গবেষণা আর ১৯৬৮ সনে গবেষণা শুরু করা হয় পোল্যাণ্ডে। অনেক বিজ্ঞানী-এ নতুন মনুষ্য উদ্ভাবিত ফসলটিকে নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে CIMMYT যখন ট্রিটিক্যাল নিয়ে গবেষণা শুরু হয় তখন এদের গাছগুলো ছিল বেশ লম্বা, ফুলের বন্ধ্যাত্বও ছিল অধিক, এরা লম্বা সময় নিত পরিপক্ক হতে। ট্রিটিক্যালির এসব সীমাবদ্ধতা ধীরে ধীরে অনেকটাই দূর করা হয়েছে।

ট্রিটিক্যাল ফসল দেখতে অনেকটা গম ফসলের মত। এদের উদ্ভিদাকৃতি একই রকম। এর দানার গুণাগুণও গমের দানারই অনুরূপ। গমের সঙ্গে ট্রিটিক্যালের পার্থক্য এই যে, ট্রিটিক্যালের বর্ধন ক্ষমতা অধিক, এর শীষগুলো বৃহদাকৃতির এবং দানাগুলো তুলনামূলকভাবে কিছুটা বড়।

অনুর্বর জমিতে ট্রিটিক্যালের ফলন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। ট্রিটিক্যাল মাটি থেকে গম অপেক্ষা অধিক নাইট্রোজেন আর রাই অপেক্ষা অধিক ফসফরাস খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করতে সক্ষম। এমনকি এর শোষিত নাইট্রোজেন ব্যবহারোপযোগিতা গম এবং রাই অপেক্ষা অধিক। অম্লধর্মী কিংবা কপারের ঘাটতিসম্পন্ন মাটিতে ট্রিটিক্যাল গমের চেয়ে ভাল জন্মে। ট্রিটিক্যাল মূলের বিস্তার অধিক। উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে তাই এ ফসল মাটি থেকে অধিক কপার শোষণ করে নিতে পারে। সংগৃহীত খাদ্য উপাদান মূল থেকে বিটপে স্থানান্তর ক্ষমতাও ট্রিটিক্যালের অধিক। রাই ফসলের মতো এর আছে অধিক খরা সহিষ্ণু ক্ষমতা। সেচ সুবিধাহীন অল্প বৃষ্টিপাতপূর্ণ এলাকায় ট্রিটিক্যালের চাষ লাভজনক। সর্বোপরি এর অভিযোজন ক্ষমতা গম অপেক্ষা অধিক।

গমের তুলনায় ট্রিটিক্যালের পুষ্টিমান উৎকৃষ্টতর। এর আমিষ অধিকতর সুষম, কারণ এতে আছে গমের চেয়ে অধিকতর মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমিনো এসিড-লাইসিন। এর আমিষের জৈবিক মান এবং পরিপাক ক্ষমতা অধিক। দেখা গেছে যে, গমের চেয়ে ট্রিটিক্যালের আমিষ শতকরা ৫০ ভাগ অধিক কার্যকর। এর দানায় আছে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খনিজ উপাদান। গমের চেয়ে ট্রিটিক্যাল আছে অধিক পরিমাণ সোডিয়াম, লোহা আর দস্তা।

পৃথিবীর বহু দেশে ট্রিটিক্যাল এখন বাণিজ্যিকভাবে আবাদ করা হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, পোলান্ড, জার্মান, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডসহ বহু দেশে ট্রিটিক্যাল একটি সফল ফসল। ইতোমধ্যে এ ফসলের তৈরি হয়েছে দু'শয়ের মতো জাত। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং পাকিস্তানে আছে এ ফসলের একাধিক আবাদি জাত। পৃথিবীর প্রায় ৭৮ ভাগ ট্রিটিক্যাল এখন আবাদ করা হচ্ছে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে। এসব দেশে এই ফসলটির আবাদ হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ৭, ৬, ৫ ও ৪ ভাগ। চীনের অল্প কয়েকটি এলাকা ছাড়া এশিয়াতে এর বাণিজ্যিক আবাদ খুব একটা হয়নি বললেই চলে। ট্রিটিক্যাল নিয়ে সক্রিয় গবেষণা চলছে এখনও ত্রিশটির মতো দেশে।

আমাদের দেশেও প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু ট্রিটিক্যাল নিয়ে এসেছিল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রাথমিক পর্যায়ের ট্রিটিক্যালের নানা রকম সীমাবদ্ধতার কারণে তা এতটা সাড়া জাগাতে পারেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নত ট্রিটিক্যাল অনায়াসে এখন আবাদ করা যেতে পারে আমাদের দেশে। নানা দেশের ট্রিটিক্যাল জাত এনে বিভিন্ন স্থানে এদের অভিযোজনক্ষমতা যাচাই করে আমাদের পরিবেশ উপযোগী দু'চারটি জাত যাচাই করা খুব দুরুহ কাজ নয়। রবি মৌসুমে সেচের অভাবে আমাদের আবাদযোগ্য বহু জমি এখনও থেকে যায় অনাবাদী। গমের চেয়ে ট্রিটিক্যাল অধিক খরা সহিষ্ণু বিধায় সেচ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় জন্মানো যেতে পারে ট্রিটিক্যাল। এমনকি অনুর্বর ও প্রান্তিক জমিতে চাষ করা যেতে পারে এ ফসল। গমের পাশাপাশি ট্রিটিক্যাল আবাদ করা সম্ভব হলে রবি মৌসুমে প্রচুর জমি চলে আসতে পারে আবাদের আওতায়।

গুণমাণ সমৃদ্ধ হলেও ট্রিটিক্যাল মানুষের খাদ্য হিসেবে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে পশু খাদ্য হিসেবে এর বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। এর দানায় অধিক মাত্রায় আমিষ থাকায় অন্য খাদ্য শস্যের পরিবর্তে পশু খাদ্যে সহজেই ট্রিটিক্যাল ব্যবহার করা যায় এবং অনেক দেশে তা ব্যবহারও হচ্ছে। বৈরি পরিবেশে ট্রিটিক্যাল বেশ ভাল ফলন দেয়। তাছাড়া এটি অধিক পরিমাণ জীবভর তৈরি করে এবং গো চারণের পর এর পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অধিক। তদুপরি তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এটি ভালোই জন্মাতে সক্ষম বলে গো-মহিষদের খাদ্য হিসেবে এটি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উপরন্তু হাঁস-মুরগির খামারে এদের পুষ্টিমাণ সম্পন্ন দানার ব্যবহার লাভজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে অনেক দেশে। আমাদের দেশে প্রাণি খাদ্যের বেশ অভাব রয়েছে। এই ফসলটির আবাদ করে গো-মহিষদের খাদ্যের পাশাপাশি এর দানা হাঁস-মুরগির খামারেও অনায়াসে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে।

ফসলের হাইব্রিড জাত

হাইব্রিড উদ্ভিদ এদের পিতামাতার চেয়ে যে অধিক তেজ সম্পন্ন হয় বিজ্ঞানীরা এটা টের পেয়েছেন সেই উনিশ শতকেই। বিজ্ঞানী কলরয়টার তামাকের হাইব্রিডের অধিক ফলনশীলতা লক্ষ্য করেন সে সময়। সবজি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একই সত্য উপলব্ধি করেন বিজ্ঞানী ডারউইনও। বিজ্ঞানী বিল অর্ধ যুগ ধরে ভুট্টার জাতগুলোর মধ্যে ক্রস করে হাইব্রিড তৈরির গবেষণা চালিয়ে যায় তখন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী জর্জ এইচ শাল হাইব্রিড সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনি ১৯০৮ সনে প্রথম ভুট্টার হাইব্রিড জাত সৃষ্টির একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে প্রথম বাণিজ্যিক ভুট্টার হাইব্রিড সৃষ্টি করা হয়। গোড়ার দিকে হাইব্রিড ভুট্টা আবাদ নিয়ে কৃষকদের তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। এ কারণে ১৯৩৩ সনে এসে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টার মোট আবাদী এলাকার শতকরা ১ ভাগ মাত্র জমিতে হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সনে বেশ খরা দেখা দেয়। খরার সময়ে ভুট্টার হাইব্রিড জাতগুলো বেশ ভাল ফলন দেয়। কৃষকেরা হাইব্রিড জাতের অধিক ফলনশীলতা দেখে হাইব্রিড চাষে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪০ সনে এসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক ভুট্টার আবাদী জমিতে হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা হয়। ততদিনে ভুট্টার হাইব্রিড জাত আরও উন্নত হয়েছে। হাইব্রিড বীজ শিল্পও এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রাইভেট কোম্পানীগুলো ভুট্টার হাইব্রিড সৃষ্টি এবং এর উন্নয়নে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করে। হাইব্রিড ভুট্টার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। ১৯৪৪ সনে এসে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮০ ভাগ ভুট্টার জমি হাইব্রিড ভুট্টার আওতায় চলে আসে। চল্লিশ দশকের শেষ ভাগে এসে সম্পূর্ণ ভুট্টার জমিতে হাইব্রিডের আবাদ শুরু হয় সেখানে। ১৯২০ এবং ১৯৯০ এর মধ্যে ভুট্টার ফলন বেড়েছে চারগুণ। অনেকের মতে ভুট্টা শতকরা ৬০-৭৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধির কারণ আসলে হাইব্রিড ভুট্টার চাষাবাদ। আর বাকি ফলনবৃদ্ধির কারণ হলো অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি যথাঃ সার, বালাইনাশক, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি প্রয়োগ।

ভুট্টার হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য এর নিজস্ব অদ্ভুত রকমের পুষ্প বিন্যাসটাকে কাজে লাগানো হয় প্রথম দিকে। ভুট্টা গাছের শীর্ষ দেশে রয়েছে পুরুষ ফুলের অবস্থান। আর নীচের দিকে কাণ্ডলগ্ন হয়ে জন্ম নেয় এক একটি স্ত্রী ফুল। ভুট্টা গাছের পুরুষ ফুলটি কর্তন করে দিলে সম্পূর্ণ গাছটি হয়ে পড়ে স্ত্রী গাছ। দানাদার খাদ্য শস্যের মধ্যে ভুট্টার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর পর-পরাগায়ন স্বভাব। তার চেয়েও বড় কথা ভুট্টার রয়েছে একটি মোচায় অনেকগুলো বীজ উৎপাদন করার ক্ষমতা। এসব কারণে স্বল্প খরচে অল্প শ্রমে F_1 বীজ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ভুট্টা ফসলে। যে দু'টি ইনব্রেড লাইনের মধ্যে পরাগায়ন সম্পন্ন করে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয় তাদের মধ্যে একটি লাইনকে স্ত্রী পেরেন্ট এবং অন্য একটি লাইনকে পুরুষ পেরেন্ট হিসেবে ধরে স্ত্রী লাইনের কয়েক সারি পর লাগানো হয় পুরুষ লাইনের একটি বা দু'টি সারি তার পর স্ত্রী লাইনের কয়েক সারি এবং পুরুষ জাতের একটি বা দু'টি সারি। পরাগায়নের পূর্বে স্ত্রী পেরেন্টের পুরুষ ফুল কেটে দেয়া হয় আগেভাগেই যেন স্ত্রী ফুলগুলো কেবল পুরুষ পেরেন্টের পরাগরেণুর দ্বারা পরাগায়িত এবং নিষিক্ত হতে পারে। গোড়াতে কিন্তু এ ভাবেই তৈরি করা হতো ভুট্টার সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিডগুলো। এভাবে হস্ত দ্বারা উৎপন্ন ভূট্টার হাইব্রিড জাতের খরচ বেশী পড়ে যায় বলে শুরু হয় বিকল্প কোন কৌশল খোঁজার পালা। এরই ধারাবাহিকতায় খুঁজে নেয়া হয় ফুলের পুংবন্ধ্যাত্ব স্বভাব।

গোড়াতে হাইব্রিড জাত তৈরির কাজটি ছিল বেশ সময় সাপেক্ষ এবং জটিল। একটি উন্নত হাইব্রিড সংযোগ খুঁজে পাওয়ার জন্য করতে হতো শত শত সংকরায়ন। এর জন্য প্রয়োজন হত প্রচুর সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক। এক সারি পুরুষ গাছের পর মাঠে লাগানো হতো চার সারি স্ত্রী গাছ। পুরুষ গাছ দেবে পরাগ আর স্ত্রী গাছ দেবে হাইব্রিড বীজ এটিই ছিল লক্ষ্য এখানে। পরাগায়নের পূর্বে স্ত্রী গাছের পুরুষ ফুলগুলো আলতোভাবে সরিয়ে নিতে হত। পুরুষ ফুল সরিয়ে নিতেই প্রয়োজন হত প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের। ভুট্টা গাছ থেকে পুরুষ ফুল সরিয়ে নেবার কঠিন কাজটি খুব বেশি দিন আর কঠিন রইলো না। ভুট্টা গাছে প্রকৃতিক ভাবে কৌলিবস্তুতে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে পাওয়া গেল এক রকম মিউট্যান্ট লাইন যার কোন পুরুষ ফুল তৈরি হতো না। তৈরি করতো কেবল শুধু স্ত্রী ফুল। সত্যি সত্যি গাছটিই হয়ে গেল স্ত্রী গাছ। প্রজননবিদদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি এ গাছ। তারা বুঝতে পারলেন মিউট্যান্ট গাছের এ স্বভাবটি যদি হাইব্রিড জাত তৈরিতে ব্যবহৃত একটি পেরেন্ট ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে আর কষ্ট করে স্ত্রী গাছ বানাবার প্রয়োজন হবে না। এটি যে জিন দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য এ সত্যও ততদিনে জানা হয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের। তবে যে গাছটি কেবল স্ত্রী গাছ হয়ে গেল সেটিই যে সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারলো তা কিন্তু নয়। কারণ গাছটি কেবল স্ত্রী হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না তাকে তৈরি করতে হবে বীজ। তার জন্য কাঙ্ক্ষিত কোন পুরুষ গাছের পুংরেণু ঘটাবে পরাগায়ন আর তা থেকে বীজ। মজার কথা বিজ্ঞানীরা সে রকম পুরুষ গাছও খুঁজে পেল যে গাছের পরাগ সংযোগ পুংবন্ধ্যা গাছে তৈরি করে শতকরা ১০০ ভাগ বীজ। এসব গবেষণা পুরো হাইব্রিড জাত তৈরির কৌশলটাই পাল্টে দিল ভীষণ ভাবে।

পুংবন্ধ্যাত্ব স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে ভুট্টার হাইব্রিড জাত সৃষ্টিতে এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন হয় তিন রকমের লাইন। একটি হলো স্ত্রী লাইন। শুধু স্ত্রী ফুল তৈরি করাই এর কাজ। এর পুরুষ ফুল বন্ধ্যা প্রকৃতির বলে অনুর্বর। এ লাইনটিকে বলা হয় 'A' লাইন। মজার বিষয় হলো এই যে একটি স্ত্রী লাইন থেকে পুরুষ বন্ধ্যা স্বাভাবটি স্থানান্তর করা যায় অন্য একটি লাইনে। এর জন্য প্রয়োজন হয় ব্যাকক্রস। এ ভাবে ইচ্ছে করলে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যটি স্থানান্তর করা যায় যত খুশী সংখ্যক ভিন্ন রকম লাইনে। সুতরাং কোন ফসল প্রজাতির কোন নিকটাত্মীয় বা মাঝারি বা দূর আত্মীয় অন্য কোন প্রজাতিতে পুংবন্ধ্যা বৈশিষ্ট্যটির সন্ধান পেলে আর যদি সে আত্মীয় বা প্রজাতি ফসল প্রজাতির সঙ্গে ক্রস করে সন্তান উৎপাদনে সফল হয় তাহলে বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আসা যায় ফসল প্রজাতিতে সহজেই। এরকম পুংবন্ধ্যা লাইন কিন্তু আপনা আপনি নিজের বংশ যেমন রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তেমনি ব্যর্থ হয় একা একা F_1 বীজ উৎপাদনেও। পুংবন্ধ্যা লাইন থেকে পুংবন্ধ্যা লাইন পাবার জন্য এর নিজের বীজ উৎপাদন একটি জরুরী বিষয়। কোন একটি নির্দিষ্ট পুংউর্বর লাইনের সঙ্গে পুংবন্ধ্যা লাইনের সংকরায়নে ফলে যে বীজ তৈরি হয় সে বীজের উদ্ভিদগুলো হয় একশত ভাগ পুংবন্ধ্যা। একে বলা হয় 'B' লাইন। 'A' লাইন এবং 'B' লাইন হুবহু একরকম। পার্থক্য শুধু এই যে 'A' লাইন পুংবন্ধ্যা আর 'B' লাইন উর্বর। 'B' লাইনকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল এক সংকরায়ন কর্মসূচী। এটি হলো 'B' লাইনকে খুঁজে পাবার আয়োজন। 'A' লাইনের সঙ্গে মাঠে সংকরায়ন করে যে লাইনটি F_1 বীজ উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে বলা হয় 'R' লাইন। উপযুক্ত 'A' লাইন আর এর বংশ রক্ষাকারী 'B' লাইন পাওয়ার পর 'A' লাইনের সাথে নানা রকম লাইন বা জাতের সংকরায়ন সম্পন্ন করে খুঁজে নেওয়া সম্ভব হয় উপযুক্ত 'R' লাইন। মাঠে 'A' লাইনের ৬-৮ সারির পর লাগানো হয় ২ সারি 'R' লাইন। এ ভাবে মাঠে বোনে দেয়া

'A' লাইন আর 'R' লাইনের মধ্যে পর-পরাগায়নের ফলে পাওয়া সম্ভব হয় স্বল্প ব্যয়ে হাইব্রিড ভুট্টার বীজ। এ ভাবে ক্রমে ক্রমে আসে ডাবল ক্রস হাইব্রিড এবং থ্রী ওয়ে ক্রস হাইব্রিড জাত। ভুট্টাতে হাইব্রিড জাত এতটাই সফল হয়ে উঠে যে যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু উন্নত দেশে ভুট্টা ফসল উৎপাদনে এখন হাইব্রিড জাত ব্যবহার করা হয় শতকরা একশত ভাগ ভুট্টার জমিতে।

ভুট্টার হাইব্রিড জাতের সাফল্যের পথ ধরে পরবর্তীতে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয় অনেক পর-পরাগী ফসলেই। এখন ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাইব্রিড জাত ব্যবহার করা হচ্ছে সরগাম, সুগার বীট, পেঁয়াজ, তুলা, ব্রাসেলস্ স্প্রাউট, মূলাসহ বহু সবজি ফসল এবং বহু সংখ্যক ফুল ফসলেও। ফসলের লিঙ্গরুপতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে শসা পরিবারের ফসলে। শসা পরিবারের প্রায় সকল ফসলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এদের ফুলগুলো এক লিঙ্গিক। লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শসা, বাঙ্গি, তরমুজ ইত্যাদি ফসলে গাছগুলো কিন্তু উভলিঙ্গিক যদিও ফুলগুলো এক লিঙ্গিক। অর্থাৎ এদের একেকটি ফুল হয় কেবল পুরুষ নয় তো কেবল স্ত্রী। পটল আর কাকরলের ফুলও একলিঙ্গিক গাছটিও এক লিঙ্গিক। গাছটি হয় কেবল পুরুষ ফুল তৈরি করছে নয়তো স্ত্রী ফুল। এ দু'টি ফসলে সংকর তৈরি করতে পারলে সংকর বংশ পরম্পরায় রক্ষা করা বেশ সহজ এদের অঙ্গজ বংশবিস্তার স্বভাবের জন্য। অন্যদের ক্ষেত্রে বংশবিস্তার হয় বীজ দিয়ে। আর লাউ, শসা, মিষ্টিকুমড়া এসব ফসলের এক একটি ফল ধারণ করে শত শত বীজ। এদের এত অধিক সংখ্যক বীজ উৎপাদন স্বভাব হাইব্রিড বীজ তৈরি করাটাকে লাভজনক করে দিয়েছে। অল্প ক'টি সংকরায়ন থেকে পাওয়া যায় প্রচুর সংখ্যক বীজ। এটি একটি বাড়তি সুবিধা এসব ফসলে। আর একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের অবস্থান ভিন্ন বলে সহজেই পুরুষ ফুলকে উপড়ে নিয়ে তৈরি করা যায় স্ত্রী ফুল সম্পন্ন গাছ। অর্থাৎ কিনা স্ত্রী গাছ। অন্য একটি উপযুক্ত জাতের পরাগরেণু কীট পতঙ্গের মাধ্যমে এসে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হলেই তৈরি হয় হাইব্রিড বীজ। হাত দিয়েও কিন্তু পরাগায়ন সম্পন্ন করা যায় যদি কীট পতঙ্গের অভাব ঘটে কোথাও। আজকালতো হাইব্রিড বীজ উৎপাদন মাঠে মৌমাছির বাসা স্থাপন করে দিয়ে অনায়াসে ঘটানো যায় পর-পরাগায়ন।

এতো গেলো এক লিঙ্গিক ফুল বিশিষ্ট উভলিঙ্গিক গাছের কথা। বিজ্ঞানীরা উভলিঙ্গিক গাছকে এক লিঙ্গিক ফুল বিশিষ্ট স্ত্রী গাছ রূপান্তরের কৌশল রপ্ত করছে শসা পরিবারের বেশ ক'টি ফসলে। শসা পরিবারের ফসলের লিঙ্গ বহুরুপতার

জেনেটিক গঠন ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে। জাপানের একটি শসা জাত 'Shogoin' জাতে প্রচুর সংখ্যক স্ত্রী ফুল তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই জাতটি থেকে স্ত্রী ফুল তৈরির জিনকে স্থানান্তর করে নিয়েছে তাদের শসার জাতে। এভাবে তাদের শসার জাতটি হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ স্ত্রী ফুল উৎপাদনকারী জাত। যে গাছ সম্পূর্ণ স্ত্রী তার বংশরক্ষা করা একা একা ঐ গাছের পক্ষে অসম্ভব। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছে যে সম্পূর্ণ স্ত্রী গাছে যদি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় জিবেরেলিক এসিড, সিলভার নাইট্রেট বা সিলভার থায়োসালফেট স্প্রে করা হয় তবে স্ত্রী গাছের কোন কোন পর্ব থেকে পুরুষ ফুল বেরিয়ে আসে। পুরুষ ফুল আর স্ত্রী ফুলের মধ্যে পরাগায়ন সম্পন্ন করে অতঃপর স্ত্রী গাছের বংশ রক্ষা করা যায়। বংশ রক্ষার বিষয়টি যখন নিশ্চিত করা গেল তখন সামনে চলে এলো হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করার বিষয়টি। কেবল স্ত্রী ফুল তৈরি করে এমন গাছের সঙ্গে একান্তর ভাবে উপযোগী পুরুষ গাছ জন্মালে অনিবার্য ভাবেই সম্পন্ন হবে পর-পরাগায়ন। তা থেকে পাওয়া যায় F_1 বীজ। এ ছাড়াও হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে আরও কিছু কায়দা কানুন রপ্ত করে নিয়েছেন বিজ্ঞানীগণ ।

বীজহীন ফল ভক্ষণের জন্য ভীষণ আরামদায়ক। বীজহীন তরমুজের চাহিদাই অন্যরকম। স্বাদও অধিক, দামও অধিক। ডিপ্লয়েড তরমুজের সঙ্গে টেট্রাপ্লয়েড তাতে কোন সন্দেহ নেই তরমুজের সংকরায়ন করে তবে পাওয়া যায় ট্রিপ্লয়েড F_1 তরমুজ। ট্রিপ্লয়েড বলে এদের জনন কোষে মিয়োসিস হয় অস্বাভাবিক রকমের। ফলে এরা তৈরি করে বন্ধ্যা গ্যামেট। আর ফলশ্রুতিতে বীজহীন ফল। স্কোয়াশের ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে পুংহীন করা হয় গাছকে। 'ইথেফোন' নামক রাসায়নিক দ্রব্য নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করে গাছটিকে স্ত্রী ফুল উৎপাদনের জন্য প্রভাবিত করা হয়। ইথেফোন ৬০০ পি পি এম মাত্রায় গাছের ২ ও ৪ পাতা পর্যায়ে প্রয়োগ করলে ফল ধারণ পর্যায়ে গাছে পুরুষ ফুল উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। আর তাতে গাছটি হয়ে পড়ে স্ত্রী। পাশে বুনে দেয়া অন্য একটি কাঙ্ক্ষিত জাতের পুংরেণু দিয়ে প্রাকৃতিক পরাগায়ন বা হস্ত পরাগায়ন সম্পন্ন করা গেলে পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড জাতের স্কোয়াশ।

বাঁধাকপি পরিবারের কোন কোন ফসলে অন্য আরেক রকমের কৌশল ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানীরা। আসলে কৌশলটি আপনা আপনি গাছেই বিদ্যমান। মানুষ একে সুকৌশলে হাইব্রিড তৈরির কাজে লাগিয়েছে মাত্র। এই পরিবারের গাছে পুংলিঙ্গিক এবং স্ত্রীলিঙ্গিক দু'রকমের ফুলই ফোটে। এদের এ দু'টি লিঙ্গই কার্যক্ষম। মজার

ব্যাপার হলো একই গাছের একই ফুলের পুরুষ লিঙ্গের পরাগরেণু ঐ গাছের একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হলে তা পরাগায়ন বা নিষেক ঘটাতে ব্যর্থ হয়। অথচ অন্য জাতের পুরুষ অঙ্গের পরাগরেণু উড়ে এসে গর্ভমুণ্ডে সংযুক্ত হলে এরা বীজ তৈরি করে। এই ঘটনাটিকে কাজে লাগিয়ে হাইব্রিড বীজ তৈরির উপায় বের করা হয়েছে যথারীতি। এক্ষেত্রে সমস্যা একটি। আর তা হলো নিজের ফুলের পরাগ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বংশরক্ষা করতে না পারা। বংশ রক্ষা করতে না পারলে তো বছর বছর এসব জাতকে পেরেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। এরও কৌশল আবিষ্কার করেছেন কিন্তু বিজ্ঞানীরা। এদের ফুল যখন কুঁড়ি (bud) অবস্থায় থাকে তখন পুংকেশর থেকে পুংরেণু নিয়ে স্ত্রী কেশরের গর্ভমুণ্ডে ঘষে দিলে আর নিষেকের সমস্যা থাকে না। তখন বীজ তৈরি করে এসব গাছ। এ বীজ দিয়ে এদের বংশরক্ষা করা সম্ভব হয়।

হাইব্রিড বীজ তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় এ রকমেরই অন্য একটি জাত। এই জাতটিতেও কিন্তু নিজের পরাগরেণু দিয়ে নিষিক্ত হয় না ডিম্বাণু (egg cell)। ফলে গাছটি থাকে অফলবন্ত এবং অবশ্যই অবীজীয়। একই ফুলের পুরষাঙ্গ ও স্ত্রীজননাঙ্গ স্বাভাবিক এবং কর্মক্ষম থাকলেও এবং দু'টি অঙ্গ একই সময়ে পরিণতি লাভ করলেও স্ব-পরাগায়ন সম্পন্ন না হওয়ায় এ অবস্থাটিকে বলা হয় স্ব-অসঙ্গতি (self-incompatibility)। দু'টি স্ব-অসঙ্গতি সম্পন্ন এ জাতীয় লাইনকে পাশাপাশি বীজ উৎপাদন মাঠে বুনে দিয়ে পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড বীজ। এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম এই যে, হাইব্রিড বীজ সংগ্রহ করা যায় দু'টি লাইন থেকেই। একটির পরাগরেণু বীজ তৈরি করে অন্য জাতে আর অন্যটির পরাগরেণু বীজ তৈরি করে প্রথমটিতে। এভাবে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয়েছে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রাসেলস্ স্প্রাউট আর ব্রোকোলীতে।

পর-পরাগী ফসলে হাইব্রিড জাতের সাফল্য স্ব-পরাগী ফসল উন্নয়নে কাজে লাগানো যায় কিনা এ বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন। দু'টি জাতের মধ্যে সংকরায়ন করা হলে প্রথম বংশধরের উদ্ভিদ যে অধিক তেজসম্পন্ন হয় এই বিষয়টি স্ব-পরাগী ফসলের জন্যও সমান সত্য। বহু স্ব-পরাগী ফসলে সংকর উদ্ভিদকে পিতা মাতা অপেক্ষা সবল ও সতেজ বলে পাওয়া গেছে। পিতা মাতার সঙ্গে সংকর উদ্ভিদের ফলনশীলতার দিক থেকে পার্থক্য বেশ তাৎপর্যময়। কোন কোন ফসলের ক্ষেত্রে ফলন এতটাই অধিক যে হাইব্রিড বীজ তৈরি করার কৌশল বের করে নিতে পারলে তাযে হবে অত্যন্ত লাভ জনক তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

স্ব-পরাগী ফসলে হাইব্রিড জাত তৈরির বড় বাঁধা হলো এদের স্ব-পরাগী স্বভাব। এদের ফুলের গঠন এমন যে অনেক ফসলে কোন পর-পরাগায়ন ঘটার সুযোগই থাকে না। এরা যে কেবল উভলিঙ্গি তা নয় বরং এদের পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ পরিপক্ক হয় এক-ই সময়ে এবং পরাগায়ন সম্পন্ন হবার পূর্বে এদের ফুল থাকে অপ্রস্ফুটিত। এরকম কঠিন স্ব-পরাগায়ন কৌশল সমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে টমেটো, বেগুন ইত্যাদি ফসলে। ফুল এদের অপ্রস্ফুটিত স্বভাবের বলে কৃত্রিম উপায়ে ফুলের ভেতর থেকে উপড়ে নেয়া হয় আলতো ভাবে পরাগধানীগুলোকে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যেন ফুলে থেকে না যায় কোন পরাগধানী বা তার কোন অংশ বিশেষ। খেয়াল রাখতে হয় যেন অক্ষত থাকে স্ত্রী কেশরটি। অতঃপর অন্য উপযোগী জাতের ফুল থেকে পরাগধানী নিয়ে এসে পরাগরেণু ছুঁয়ে দিতে হয় স্ত্রী কেশরের গর্ভমুণ্ডে। আমাদের অলক্ষ্যে পরাগরেণু অতঃপর অঙ্কুরিত হয়ে তৈরি করে পরাগনল। পৌঁছে যায় ডিম্বকে। তৈরি হয় এক একটি হাইব্রিড বীজ। যেহেতু প্রতিটি টমেটো এবং বেগুনে থাকে অনেক বীজ ফলে এরকম হস্ত পুংহীনকরণ (emasculation) এবং হস্ত পরাগায়ন করে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন বেশ লাভজনক।

ধানে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন করে বাণিজ্যিক চাষাবাদ করা সম্ভব এটি ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে একটি অকল্পনীয় বিষয়। একটি ফুল ধানে তৈরি করে একটি মাত্র বীজ। একটি ফুলে পরাগায়ন সম্পন্ন করে তৈরি হয় এই একটি মাত্র বীজ। অন্যদিকে স্ব-পরাগী ফসল এটি। পরাগরেণু উড়ে গিয়ে অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ড সতত পড়বে ধানে এটি তেমন সাধারণ কোন কর্মকাণ্ড নয়। প্রায়শঃই ধানের ফুল আবদ্ধ প্রকৃতির। একই ফুলের পরাগরেণু ঐ ফুলের গর্ভমুণ্ড পতিত হয়ে এক সময় নিষেক ঘটায়। এ রকম দু'টি প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করার পদ্ধতি আবিস্কার করেন চীনের বিজ্ঞানী ইউয়ান লং পিং। তাকে তাই হাইব্রিড ধানের জনকও বলা হয়। তিনি ১৯৬৬ সনের কোন এক দিন তাঁর গবেষণার মাঠে কাজ করতে করতে পুংবন্ধ্যা গাছের সন্ধান পেলেন। এই বৈশিষ্ট্যটি তিনি অন্য গাছে স্থানান্তর করলেন। এভাবে পেলেন কাঙ্ক্ষিত 'A' লাইন। খুঁজে পেলেন অতঃপর 'B' লাইন। নানা রকম সংকরায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পেলেন উপযুক্ত 'R' লাইন। এবার মাঠে নির্দিষ্ট অনুপাতে বপন করলেন 'A' লাইন এবং 'R' লাইনের চারা গাছ। সংকরায়নের মাধ্যমে পেলেন ধানের হাইব্রিড বীজ। এভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ধানের হাইব্রিড বীজ উৎপাদন কৌশল আরও উন্নততর করা হলো। বাণিজ্যিক ভাবে

শুরু হলো হাইব্রিড ধানের আবাদ। ক্রমশ চীন দেশ থেকে প্রযুক্তি পৌঁছে গেল আশে পাশের ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোতে। আমাদের দেশেও শুরু হলো হাইব্রিড ধান নিয়ে গবেষণা। শুরু হলো আমাদের মাঠে হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কর্মকাণ্ড।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪৮.১০ মিলিয়ন। এ জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে বর্তমানে আমাদের ২৪.৫৪ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্যের প্রয়োজন হচ্ছে। আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে ১.৩৪% হারে। ফলে ২০১৫ সালে আমাদের মোট জনসংখ্যা হবে ১৫৩.২২ মিলিয়ন আর খাদ্য চাহিদা হবে ২৫.৪৫ মিলিয়ন টন। ২০২৫ সনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৬৮.৯৬ মিলিয়নে দাঁড়াবে যখন আমাদের খাদ্যশস্যের চাহিদা হবে ২৮.০৬ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ কিনা আগামী ১০-১২ বছরের মধ্যে আমাদের ৪ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। অথচ জমি কমছে প্রতিবছর শতকরা ১ ভাগ হারে। ফলে আরোও অল্প পরিমাণ জমিতে ফলাতে হবে আরও অধিক পরিমাণ ফসল। এরকম একটি বাস্তবতায় ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য যা যা প্রযুক্তি আমাদের প্রয়োজন তা আমাদের ব্যবহার করতে হবে। হাইব্রিড বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি এরই একটি অত্যন্ত কার্যকর ফসল উন্নয়ন প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ আগামী দিনে ফসলের উৎপাদনে ইতিবাচক সাড়া ফেলবে এমন প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

১

বাংলাদেশের হাইব্রিড ধানের সমস্যা ও সম্ভাবনা

হাইব্রিড ধান জাত উদ্ভাবন এবং হাইব্রিড ধান জাতের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বাস্তব উদাহরণ। ধানের ফুল এবং এর প্রজনন কৌশলের চমৎকার রূপান্তর করে পাওয়া হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন কৌশল ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আজ এক অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে নিয়ে এসেছে। চীন দেশে এই প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ হেক্টর প্রতি আজ পনের টন ধান উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যা প্রচলিত ইনব্রেড জাতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। হাইব্রিড ধান জাত তাই পৃথিবীর এক বিশাল জনগোষ্ঠির আশির্বাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে হাইব্রিড ধান চাষ শুরু হয়েছে ২০০১ সনে। এ বছর এদেশে হাইব্রিড ধান চাষের যুগপূর্তি হচ্ছে। এই বার বছরে হাইব্রিড ধানের আবাদী এলাকা বেড়েছে তাৎপর্যপূর্ণ রকম ভাবে। শুরুতে হাইব্রিড ধান বীজ বিক্রি হয়েছিল মাত্র ১৫ টন, যা ২০০৮ সনে এসে দাঁড়ায় ১০,০০০ টনের অধিক। এক যুগের মাথায় এসে ২০১১ সনে হাইব্রিড ধান বীজ বিক্রি হয়েছে ৭০০০ টনের মত। ২০০৮ সনে এসে হাইব্রিড ধানের বীজের চাহিদা বেড়েছে প্রায় ৪০০-৫০০ গুণ। হাইব্রিড ধানের কিছু সুফল আছে বলেই কিন্তু কৃষক হাইব্রিড জাতের ধান আবাদ করছে। এসব সুবিধার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে হাইব্রিড ধানের প্রচলিত ইনব্রেড উচ্চ ফলনশীল ধান জাত ব্রি ধান ২৯ বা ক্ষেত্র বিশেষে ব্রি ধান ২৮ অপেক্ষা গড়ে শতকরা ২০ ভাগ অধিক ফলন দেবার ক্ষমতা। এক হিসেবে দেখা যায় যে, বোরো মৌসুমে মিলে আমাদের দেশে ধানের গড় ফলন যেখানে হেক্টর প্রতি ৫.৫ টন সেখানে হাইব্রিড ধানের গড় ফলন হচ্ছে হেক্টর প্রতি ৭.৪ টন।

হাইব্রিড ধানের দ্বিতীয় সুবিধা হলো বড় মাপের ইনব্রেড জাতগুলো অপেক্ষা এদের তুলনামূলকভাবে স্বল্প জীবনকাল। চারা রোপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত উফশী জাতগুলোর লাগে ১৫০-১৬০ দিন। অন্য দিকে হাইব্রিড ধানের জীবনকাল হলো ১৪০-১৪৫ দিন। হাইব্রিড ধানের কিছুটা আগাম পরিপক্কতা মানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকার হাত থেকে বেঁচে যাবার একটি সুযোগ পাওয়া। সুতরাং হাইব্রিড ধান আবাদের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গত দু'চার বছরের হাইব্রিড ধানের বীজ বিক্রয়ের পরিসংখ্যান বেশ হতাশাব্যঞ্জক। বিগত ২০০৯ ও ২০১০ সনে ১০ হাজার টন হাইব্রিড বীজ বিক্রয়ের সরকারী লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এ সময় কালে প্রকৃত পক্ষে বিক্রি করা হয়েছে ৬/৭ হাজার টনের মত বীজ। কিছু দিন ধরেই পত্র পত্রিকায় কোন কোন হাইব্রিড ধানের জাত নিয়ে দেশের নানা অঞ্চল থেকে বিরুপ প্রতিবেদন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দেশে হাইব্রিড ধান জাত আবাদের প্রতি কৃষকগণ ধীরে ধীরে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ২০০১ সন থেকে ২০০৮ পর্যন্ত হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০০৯ সন থেকে হাইব্রিড ধান জাত আবাদের প্রতি কৃষকদের মধ্যে এক ধরনের টানাপোড়েন যেন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাজারে এখন অনেক বেশি প্রাইভেট কোম্পানীর হাইব্রিড ধান জাতের বীজ থাকায় ভালো মন্দ দু'রকমের বীজই কৃষকদের হাতে পৌছে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অনেকটা তড়িঘড়ি করে যথেষ্ট পরীক্ষা না করেই ধানের জাতের নিবন্ধন আদায় করে নিতে পেরেছে কোন কোন বীজ কোম্পানী বা বীজ ব্যবসায়ী। এসব জাত আবাদ করে কৃষক এখন সমস্যায় নিপতিত হয়েছে। এতে কৃষক ব্যক্তিগত ভাবে যেমন ক্ষতির মুখে পড়েছেন, তেমনি এর ফলে বোরো ধানের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া হাইব্রিড জাতের প্রতি কৃষকের একটি নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠতে পারে যা আমাদের এক অপূরণীয় ক্ষতির দিকে ঠেলে দিবে।

আমাদের দেশে হাইব্রিড ধান জাত সৃষ্টিসহ হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন এবং হাইব্রিড ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা বলা যাবে না। আমাদের দেশপোযোগী উত্তম হাইব্রিড ধান জাত আমরা এখনও উদ্ভাবন করতে সক্ষম হইনি। আমাদের দেশের কয়েকটি বীজ কোম্পানী কয়েক বছর যাবৎ স্থানীয় ভাবে হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু করেছে। মোট হাইব্রিড ধান বীজের প্রায় এক চতুর্থাংশ মাত্র দেশের মাটিতে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। আর তাও করা হচ্ছে চীন বা ভারত থেকে প্রবর্তিত 'এ' এবং 'আর' লাইনকে ব্যবহার করে। ফলে হাইব্রিড ধান আবাদের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে আমদানী করা হাইব্রিড বীজের ওপর। এরই নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে হাইব্রিড ধান জাতের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং শেষ পর্যন্ত এর ফলনের ওপর।

গত দু'তিন বছর ধরে হাইব্রিড ধান আবাদের প্রতি কৃষকের আগ্রহে খানিকটা ভাটা পড়ার কারণ আসলে একাধিক। মাঠের সাথে যাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তাদের মতে ধান চালের দাম কমে যাওয়ার কারণে কৃষক হাইব্রিড ধান চাষ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এমনিতেই ধান চাষ এখন বেশ ব্যয় সাপেক্ষ একটি কর্মকাণ্ড। আর হাইব্রিড ধান আবাদ করতে খরচ কিছুটা বেশি হওয়ায় ধানের ন্যায্য

মূল্য না পাওয়ার কারণে হাইব্রিড জাত আবাদের লোকসানটা আর একটু বেশি। ফলে বাড়তি লোকসান দিয়ে কৃষক হাইব্রিড ধান চাষ চালিয়ে যাবে এটি ভাবা ঠিক নয়।

মূলত বোরো মৌসুমে এদেশে হাইব্রিড ধানের আবাদ করা হয়। বোরো মৌসুমে আমাদের আধুনিক বোরো ধান জাতের আবাদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলায় হাইব্রিড ধানের জাতও আবাদ করেছেন আমাদের কৃষকগণ। আর এসব হাইব্রিড জাতের আবাদ করতে তাদের হাইব্রিড ধান বীজ কিনতে হয়েছে বিভিন্ন বীজ কোম্পানীর স্থানীয় কর্মীদের কাছ থেকে। হাইব্রিড ধান বীজ ব্যবসা লাভজনক মনে করে এ ব্যবসায় জড়িত হয়েছেন নানা রকমের লোকজন। এদের কোন কোন প্রাইভেট কোম্পানী বেশ বড়সড় এবং এদের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীও রয়েছে। কিন্তু অনেকগুলোরই আয়োজন বড় অল্প কিন্তু লাভের আশা অনেক। বিদেশ থেকে হাইব্রিড বীজ আমদানী করে তা কৃষকের কাছে বিক্রি করতে পারলেই তাদের লাভ। সুন্দর মোড়কে নানা চটকদার নাম দিয়ে এসব হাইব্রিড বীজ তারা বিক্রি করছেন দেশের নানা স্থানে।

বিদেশ থেকে হাইব্রিড ধান বীজ এনে দেশে হাইব্রিড ধান চাষের সমস্যা আসলে একাধিক। হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় তিন রকমের পেরেন্ট লাইন। এদের নাম হলো 'এ' লাইন, 'বি' লাইন এবং 'আর' লাইন। বিদেশ থেকে আমদানী করা হাইব্রিড ধানের এসব পেরেন্ট লাইনের এদেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা আছে কিনা তা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই অপরীক্ষিত থেকে যাচ্ছে। ফলে এদের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে পাওয়া হাইব্রিড ধান এদেশে খুব ভাল ফলাফল দিবে এটি মনে করার খুব বেশি কারণ নেই। অবশ্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে এ যুক্তি আসতে পারে যে, তারা যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই এসব জাত বাজারজাতকরণ করেছে। এটি যে একেবারে মিথ্যে তাও কিন্তু নয়। আবার এটি যে একেবারে সত্য তাও নয়।

কোন নতুন ভৌগলিক পরিবেশে কোন হাইব্রিড ধান জাত বা হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত 'এ' এবং 'আর' লাইনের বীজ আমদানী করে হাইব্রিড ধান প্রযুক্তির সম্পূর্ণ সুফল পাওয়ার সুযোগ আসলে নেই। কোন উদ্ভিদের কোন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য যেমন সময় দরকার তেমনি এর খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা যাচাইও বেশ খানিকটা সময় ধরেই করতে হয়। বীজ বিক্রয়ের বিষয়টি প্রাধান্য পায় বলে অভিযোজন ক্ষমতা যাচাইয়ের বিষয়টিযে খানিকটা তাড়াহুড়ো করে সম্পন্ন করা হয় আর তাতে করে যে যাচাইয়ের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় সেটি আমাদের বুঝতে হবে। টেকসই হাইব্রিড ধান প্রযুক্তির বিকাশ সাধন করতে হলে একদিকে যেমন উত্তম অভিযোজনক্ষম হাইব্রিড জাতকেই কেবল বাজারজাত করতে

হবে তেমনি হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য উত্তম অভিযোজনক্ষম ইনব্রেড লাইনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বীজ ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে এরকম একটি প্রযুক্তির প্রতি কৃষকসহ সকল মহলের নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠুক এটি আমাদের কারও কাম্য নয়। আমাদের শৈথিল্যতার দায়ভার হাইব্রিড প্রযুক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া যে সঠিক কাজ হবে না সেটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

বাংলাদেশের হাইব্রিড ধানের আবাদ শুরু হয়েছে এক যুগেরও আগে। গোড়াতে মূলত বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধান আবাদ করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। বাংলাদেশে অবশ্য এখনও বোরো মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ধানের ফলন সর্বাধিক। সাধারণত প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল ইনব্রেড জাত অপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ অধিক ফলন দান করতে সক্ষম হলে তবেই হাইব্রিড জাতকে অবমুক্তি করার অনুমতি দান করা হয়। বাংলাদেশে এ যাবৎ ১০০টি হাইব্রিড ধান জাত অবমুক্তির জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হাইব্রিড ধান আবাদের যুগপূর্তিতে এসে এত অধিক সংখ্যক হাইব্রিড জাত অবমুক্তি এবং হাইব্রিড ধান আবাদ করতে মাঠে উদ্ভূত বেশ কিছু সমস্যা আজ আমাদের অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নিজেদের স্বার্থেই আজ সেসব প্রশ্ন আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে, প্রকৃত সমস্যাগুলো কি তা জানতে হবে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা আমাদের নেওয়া উচিত সে সব উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের ভুল, আমাদের শৈথিল্যতা আর অসততার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকলে এর দায়ভার হাইব্রিড জাতের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না কিছুতেই।

হাইব্রিড ধান জাতের আমদানী করা বীজ ব্যবহারের আর একটি বড় অসুবিধা হলো এসব জাতের গাছে বীজ বাহিত রোগ জীবাণুর আক্রমণ। আমাদের সঙ্গনিরোধ পরীক্ষাগারগুলো কোন দিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যন্ত্রপাতির অভাব, দক্ষ লোকবলের অভাব এবং দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যতার কারণে রোগ জীবাণুসহই দেশের ভেতরে চলে আসে হাইব্রিড ধানের বীজ। তদুপরি এত অধিক পরিমাণ বীজের মান যাচাই এবং বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রোগ জীবাণুর সন্ধান লাভ করাও খুব সহজ কাজ নয়। আর এসব যাচাই বাছাই করার জন্য বেশ সময়েরও কিন্তু প্রয়োজন। গবেষণাগারে বীজ গজানো ও অন্যান্য পরীক্ষার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও এদের পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। তার জন্য আমদানীকারকদের সময় দিতে হবে এবং সঙ্গ নিরোধ কর্মকর্তাদেরও দেশের স্বার্থে ধৈর্য্য ধরে এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে বৈকি।

আমদানীকারকদের অনেকেরই সারা দেশ জুড়ে আমদানীকৃত হাইব্রিড বীজের দক্ষতা এবং এদের ফলনশীলতা যাচাই করার মতো দক্ষ জনবল, অর্থ ও অন্যান্য

ভৌত সুযোগ সুবিধা নেই। ফলে অল্প দু'চারটি স্থানে তাও আবার এক দুই মৌসুমের ফলাফল দেখে কোন হাইব্রিড জাতের দেশ ব্যাপি বাজারজাতকরণের অনুমতি কতটা যৌক্তিক তা আমাদের ভাবতে হবে। কোন কোন আমদানীকৃত হাইব্রিড জাত কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে। কোন কোনটা সারা দেশ জুড়ে উত্তম জাত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে আবার কোন কোনটা কোন এলাকার জন্যই উত্তম বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষায় যাদের সুযোগ নেই তারা কি করে বলতে পারে সারা দেশে তাদের হাইব্রিড জাতের আবাদ করা যাবে কি যাবে না?

হাইব্রিড ধান বীজ নিয়ে আমাদের বীজ কোম্পানীগুলোকেও ভাবতে হবে অনেক কিছু। মূলত চীনের কোন কোন বীজ কোম্পানীর কাছ থেকেই কিন্তু আমাদের দেশের কোম্পানীগুলো বীজ আমদানী করে থাকে। বিদেশী কোম্পানীগুলোও তাদের হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন করে চীন দেশের নানা স্থানে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য চীনের যে অঞ্চলের বীজ বাংলাদেশের কোম্পানীকে সরবরাহ করা হলো আবাদ করার জন্য যদি অন্য অঞ্চলে তৈরি করা বীজ বাংলাদেশে রপ্তানী করা হয় তাহলে কিন্তু আগের পরীক্ষা নিরীক্ষা কোন কাজেই আসবে না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রকম পরিবেশ-প্রতিবেশ। বীজ আমদানির আগে এসব বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে কিন্তু অবশ্যই।

আমাদের অনেক বীজ কোম্পানীগুলোতে দক্ষ উদ্ভিদ প্রজননবিদ নিয়োগ দেওয়া হয়নি। অবশ্য অনেকগুলোতে কোন উদ্ভিদ প্রজননবিদই নেই। ফলে আমদানী করা হাইব্রিড বীজের দক্ষতা পরীক্ষা নিরীক্ষা কতটা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সংঘটিত হয় সেটিও দেখতে হবে। কমপক্ষে দুই মৌসুমে দেশের ভিন্ন পরিবেশিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বমূলক নির্ধারিত দশ বারটি স্থানে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল ছাড়া কোন হাইব্রিড জাতেরই নিবন্ধন করা উচিত নয় বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

ধান জাত নিবন্ধন করার একটি চমৎকার পদ্ধতি এদেশে চালু রয়েছে, যদিও পদ্ধতিটি একটু বেশী সময় নেয়। গুরুত্বপূর্ণ ফসল হিসেবে ধান, পাট, গোলআলু, ইক্ষু, গম এ পাঁচটি ফসলের নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটা কিছুটা দীর্ঘ হলেও তা বেশ কার্যকরও বটে। তবে হাইব্রিড ধান জাত নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সে তুলনায় বেশ ঢিলেঢালা। হাইব্রিড বীজ আমদানীকারকদের বীজ আমদানীতে উৎসাহিত করা এর একটি অন্যতম কারণ বটে। তবে উদারনীতির ফলে এ নিয়ে যে সমস্যাও তৈরি হতে পারে হাইব্রিড ধান জাত নিবন্ধন তার একটি প্রমাণ।

হাইব্রিড ধান জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধনকরণ পদ্ধতিটি গত এক যুগে কয়েকবার কিছুটা করে হলেও পাল্টেছে বটে, তবে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ সঠিক হয়েছে তা বলা যাবে না। এ দেশে ২০০০ সন নাগাদ মোট ৯টি কৃষি অঞ্চলে হাইব্রিড জাতের গড় ফলন উত্তম ইনব্রেড জাত যেমন ব্রি ধান ২৮ বা ব্রি ধান ২৯ অপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ অধিক হলেই হাইব্রিড জাতটিকে সারা দেশে আবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হতো। ২০০৩ সনে অঞ্চল ভিত্তিক হাইব্রিড ধান জাত নিবন্ধন প্রথা চালু হয় যা নতুন জাত নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। ফলে প্রতি বছরই একাধিক হাইব্রিড জাত নিবন্ধন হতে থাকে যার নেতিবাচক প্রভাবও হাইব্রিড ধান আবাদে পরতে শুরু করে। বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দু'টি অঞ্চলে পর পর দুই বছর হাইব্রিড জাত জনপ্রিয় চেক জাত অপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ অধিক ফলন দিলেই উল্লেখিত অঞ্চলগুলোতে হাইব্রিড জাতটি অবমুক্ত করা যায়। হাইব্রিড জাত অবমুক্তকরণ পদ্ধতির সহজিকরণ এখন বেশ দ্রুত বীজ কোম্পানীগুলোকে হাইব্রিড বীজ ব্যবসায় জড়িত হতে আগ্রহী করে তুলছে। ২০১২ সনের এক হিসেবে দেখা যায় যে, এদেশে ইতোমধ্যে ১০০টি হাইব্রিড ধান জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি ছোট দেশে এত অল্প হাইব্রিড ধান আবাদী এলাকার জন্য ১০০টি হাইব্রিড জাত নিবন্ধীকরণ এটাই প্রমাণ করে যে, কৃষকের হাইব্রিড ধান জাত আবাদের আগ্রহের চেয়ে বীজ কোম্পানীগুলোর হাইব্রিড ধান জাতের বীজ ব্যবসা করে মুনাফা অর্জনের তাগিদটি যেন অধিক। তড়িঘড়ি করে অধিক সংখ্যক জাত ছাড়করণ জাত যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একরকম শৈথিল্যতার বিষয়টিই সামনে নিয়ে আসে।

অল্প কিছুদিন ধরে প্রাইভেট বীজ কোম্পানীসহ কোন কোন এনজিও ব্যক্তিবর্গ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপে ধানের ইনব্রেড জাত নিবন্ধনকরণের প্রক্রিয়াকে সহজ করার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াটি সহজতর হলে ইনব্রেড ধান জাত ছাড় করার দিকে তারাও আগ্রহী হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্ছে। তবে হাইব্রিড বীজ ধান নিবন্ধনকরণের সহজ পন্থা আমাদের স্পষ্টই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, ধানের মত একটি প্রধানতম ফসল নিয়ে কোনরকম শিথিল জাত ছাড়করণ পদ্ধতি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে। এখন বরং আমাদের ভাবা উচিত হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতিটিকে আরেকটু কার্যকর কি করে করা যায় সেটি নিয়ে।

২০১০-১১ সনে মোট বোরো ধানের আবাদ হয় ৪৮০০০০০ হেক্টর জমিতে যার মধ্যে হাইব্রিড ধানের আবাদী এলাকা হলো মাত্র ৬৫৮০০০ হেক্টর যা বোরো ধানী জমির মাত্র শতকরা ১৩.৭ ভাগ। সেচ নির্ভর বোরো মৌসুমে আমাদের হাইব্রিড

ধান চাষের এলাকা সম্প্রসারণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য হাইব্রিড ধান জাতের বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। আর সেটা করা সম্ভব হলে হাইব্রিড ধান চাষ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে।

শুধু বোরো মৌসুমে হাইব্রিড জাতের আবাদ সীমাবদ্ধ থাকবে এটি ঠিক নয়। ইতোমধ্যে অবশ্য কৃষক কোন কোন হাইব্রিড ধান আমন কিংবা আউশ মৌসুমেও আবাদ করছেন। এই দুই মৌসুম উপযোগী হাইব্রিড ধান জাত বাছাই করে নিতে পারলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা বেশ সহায়ক হবে। ব্রি বিজ্ঞানীরাও ইতোমধ্যে আমন মৌসুম উপযোগী হাইব্রিড ধান জাত উদ্ভাবন করেছেন। কোন কোন প্রাইভেট কোম্পানীও আমন/আউশ মৌসুম উপযোগী হাইব্রিড ধান জাত বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে। এই দুই মৌসুমে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের সুযোগ অধিক থাকায় হাইব্রিড ধান চাষের খরচ কিছুটা হ্রাস পাবে বলে মনে হয়।

ধানের ফলন বৃদ্ধি করার যত রকম প্রযুক্তি আছে আমাদের এদের কোনটিকেই অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘণবসতিপূর্ণ দেশের মানুষ হিসেবে প্রতিদিনই কমছে আমাদের চাষের জমির প্রাপ্যতা। প্রতিবছর আমাদের বিদ্যমান জনসংখ্যার সাথে যোগ হচ্ছে প্রায় ২০ লক্ষ নতুন মুখ অন্যদিকে প্রতি বছর আমাদের জমি কমছে প্রায় ০.৮ লক্ষ হেক্টর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদের প্রতি বছর খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে পাঁচ লক্ষ টন। আগামী দিনগুলোতে অল্প জমিতে ফলাতে হবে অধিক ফসল। ফলে এটিযে একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ তা সহজেই অনুমান করা চলে। এরকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দিন দিন হাইব্রিড ধানের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। আর তা আমাদের পারতে হবে, কারণ এছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই।

ধানের হাইব্রিড বীজ উৎপাদন কৌশল একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাগ্রসর প্রযুক্তি। উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির উৎকর্ষতার একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর এই প্রযুক্তি। এর স্বার্থক প্রয়োগ চীনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে এনেছে। এখন চীনা বিজ্ঞানীগণ হেক্টর প্রতি ১৫ টন ফলন দিতে পারে তেমন হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন একটি বিজ্ঞান নির্ভর চমৎকার কৌশল আমরা ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হবো তা হয় না। বরং আমাদের গবেষণার সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোকে ভাগ করে নিয়ে সুসমন্বিত ভাবে নানামুখী গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। জ্ঞান ভিত্তিক তেমন গবেষণা আমাদের চালাতে হবে আগামী দিনের খাদ্যের চাহিদার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই। সময় লাগলেও তা যে আমরা পারবো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১

হাইব্রিড ভুট্টা

ভুট্টা বাংলাদেশের এক মাত্র ফসল যা শতকরা ১০০ ভাগ আবাদ করা হচ্ছে হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে। ১৯৭৫ সনে ভুট্টার কম্পোজিট জাত দিয়ে এর আবাদ শুরু করা হলেও এটি তখন কৃষকদের নিকট বেশি গ্রহণ যোগ্য হয়ে উঠেনি। নিম্ন ফলন, বিচ্ছিন্ন আবাদ, ভুট্টা চাষ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব এবং বাজারজাতকরণের সমস্যা সব কিছু মিলে ভুট্টার চাষ তেমন সাড়া জাগাতো পারেনি তখন। এদেশে হাইব্রিড ভুট্টার প্রবর্তন এবং এদের চাষাবাদ শুরু হলে এদের অধিক ফলনশীলতা সহজেই কৃষকের নজর কাড়ে। বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাক ১৯৯৩ সনে থাইল্যান্ডের প্যাসিফিক বীজ কোম্পানীর কাছ থেকে এদেশে হাইব্রিড বীজ এনে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে দেয়। সেই থেকে ধীরে ধীরে এদেশে ভুট্টার হাইব্রিড বীজ ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভুট্টা এখন বাংলাদেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ধান এবং গমের পরেই এর স্থান। তবে ভুট্টার চাষের প্রতি কৃষকের যে আগ্রহ তা দেখে সহজেই অনুমান করা চলে যে, শীঘ্রই এটি এ দেশের দ্বিতীয় দানা শস্যে পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত ১৯ বছরে ভুট্টার জমি ও উৎপাদনের হার কমেছে যথাক্রমে শতকরা ২.৯০ ও ৩.৫৯ ভাগ এবং ফলন কমেছে শতকরা ০.৬৯ ভাগ। মূলত ভুট্টার প্রচলিত মুক্ত পরাগী জাত ব্যবহারের কারণে এটা হয়েছে। তখনও এদেশে হাইব্রিড জাতের আবাদ শুরু হয়নি। হাইব্রিড ভুট্টার বীজ ব্যবহার এবং ভুট্টা আবাদের কলা কৌশলের আধুনিকায়ন পুরো চিত্রটাই কিন্তু পাল্টে দিয়েছে। বেড়েছে ভুট্টার আবাদি এলাকা, বেড়েছে মোট উৎপাদন ও ফলনশীলতা। ১৯৮৭-৮৮ সনের সাথে ২০০৩-০৪ সনের তুলনা করলে দেখা যায় যে, আবাদী এলাকা, উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৯.৮৩%, ৩৪.৪০% এবং ১৪.৫৬%। ফলনের দিক থেকে বাংলাদেশে বর্তমানে ভুট্টার গড় ফলন কিন্তু হেক্টর প্রতি ৫.৩৬ টন যা ধান এবং গমের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

ভুট্টাকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। মানুষের খাদ্য হিসেবে ভুট্টা পৃথিবীর বহু দেশে ব্যবহার হয়ে আসছে। ভুট্টা রুটি, পরোটা বানানোর পাশাপাশি গমের আটার

সাথে ভুট্টার আটা মিশিয়ে বা গোল আলুর সাথে ভুট্টার আটা মিশিয়ে চমৎকার রুটি বানানো যায়। এছাড়াও ভুট্টা ফিরনি, ভুট্টা গজা, ভুট্টা মুরগি সুপ, ভুট্টা পোলাও, ভুট্টার মোচা পোড়া, খৈ, মোয়া, মুড়কি, নাড়ু, পিঁয়াজু, হালুয়া, ভুট্টার তেলের পিঠা, ভুট্টার সুজি, বিস্কুট, নিমকি, চপ, সিঙ্গারা, চিপস, ভুট্টা খিচুরী, পায়েস, চাপাতি ইত্যাদিতে নানাভাবে ভুট্টাকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

ভুট্টার দানা মানুষের জন্য যেমন পুষ্টিকর তেমনি তা হাঁস-মুরগির জন্যও পুষ্টিকর। দিন দিন হাঁস মুরগির খামার বৃদ্ধি পাবার প্রেক্ষাপটে ভুট্টার দানার চাহিদা কিন্তু বেড়েই চলেছে। গোখাদ্য হিসেবেও ভুট্টার সবুজ পাতা, চারাগাছ, গাছের ডাটা, আধা পাকা পাতা, ভুট্টার সাইলেজ, ভুট্টার দানা ব্যবহৃত হয়। মাছের খাবার হিসেবেও ভুট্টার গুড়া দানা ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া ভুট্টা থেকে স্টার্চ, ভুট্টার তেল, কর্ণফ্লেক্স, কর্ণ সিরকা, টিনজাত ভুট্টা, কনফেকশনারী দ্রব্যাদি এমনিতর নানারকম শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনেও ভুট্টার ব্যবহার করা হয়। ভুট্টার তেলের গুণ মান বেশ উন্নত। ভুট্টার দানায় শতকরা ৭-১২ ভাগ তেল রয়েছে। ভুট্টার তেলে পলিআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ শতকরা ৪৫ ভাগ থাকায় এটি সকলের জন্যই উত্তম ভোজ্য তেল। জ্বালানী হিসেবেও শুকনো ভুট্টা গাছ অতি উত্তম।

বাংলাদেশে ভুট্টার চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এদেশে ভুট্টার কৌলিসম্পদ সংগ্রহ করতে শুরু করে। এসব কৌলিসম্পদ থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ও রোগ বালাই প্রতিরোধক্ষম জাত বাছাই এবং উদ্ভিদ প্রজনন প্রক্রিয়ায় এদের উন্নয়ন সাধন করে তা সাধারণ চাষাবাদের জন্য কৃষকের নিকট অবমুক্ত করে। ১৯৮৬ সনেই ভুট্টার তিনটি জাত অবমুক্ত করে বিএআরআই। এরপর ১৯৯০, ১৯৯৭, ১৯৯৮ সনে একটি করে জাত অবমুক্ত করে বিএআরআই। ২০০২ সনে এসে আরও দু'টি জাত অবমুক্ত করা হয়। এই আটটি জাতই ছিল মুক্ত পরাগী জাত। বিএআরআই কর্তৃক অবমুক্ত মুক্ত পরাগী ভুট্টার জাতগুলো হলো- বর্ণালী, শুভ্র, খইভুট্টা, মোহর, বারি ভুট্টা-৫, বারি ভুট্টা-৬, বারি ভুট্টা-৭ এবং বারি সুইট কর্ণ-১। এদের ফলন হেক্টর প্রতি ৩-৪ টনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২০০০ সন থেকে বিএআরআই গড়ে প্রতি বছর একটি করে ভুট্টার হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করতে শুরু করে। ২০১১ সন নাগাদ এ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা ১১টি হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করে।

বারি অবমুক্ত করা হাইব্রিড ভুট্টার জাতগুলো হলো- বারি হাইব্রিড ভুট্টা- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১। এর মধ্যে তিনটি জাত তিনটি করে পেরেন্ট লাইনের মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে বিধায় এদেরকে ত্রি-ওয়ে হাইব্রিড বলা হয়। একটি হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে শীর্ষ সংকরায়নের মাধ্যমে। আর বাকী ৭টি হাইব্রিড ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে দু'টি করে ইনব্রেড লাইনের মধ্যে সিঙ্গেল ক্রস করে। বিভিন্ন প্রয়োজনকে মাথায় রেখে এসব জাত উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানীরা। ভুট্টার খই উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে 'খই ভুট্টা' নামক একটি জাতই উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানীরা। ভুট্টাকে আটা-ময়দা করে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি তৈরি করা, হাঁস-মুরগির খাদ্যের অন্যতম উপকরণ হিসেবে, পশু খাদ্য, গরুর সবুজ খাদ্য হিসেবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্টার্চ উৎপাদনের জন্য এসব জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাজারে ভুট্টার চাহিদা থাকায় ভুট্টা ফসল উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সরাসরি ভুট্টা বীজ আমাদানী করেও এদেশে ভুট্টার আবাদ চলছে।

১৯৯৩ সনে ভুট্টার হাইব্রিড জাত প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশে ভুট্টা জনপ্রিয় হতে শুরু করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফসল বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর (CDP) আওতায় বীজ শিল্প উন্নয়ন ইউনিট (CIPU)-এর অধীনে সেসময় সমন্বিত ভুট্টা উন্নয়ন প্রকল্প (IMPP)-এর মাধ্যমে বৃহত্তর রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগে হাইব্রিড ভুট্টা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে চারটি এনজিও প্রতিষ্ঠান যথা- ব্র্যাক, গ্রামীন কৃষি ফাউণ্ডেশন, গ্যাঞ্জেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং প্রশিকা এই অঞ্চল দু'টিতে ৬০০ প্রদর্শনী প্লট করে কৃষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। ব্র্যাক এসব প্রদর্শনী প্লটের প্রায় অর্ধেক বাস্তবায়ন করে থাকে। হাইব্রিড বীজের পাশাপাশি কৃষককে সার এবং কারিগরী সহায়তাও প্রদান করা হয়। সেসময় প্রচলিত কম্পোজিট জাত অপেক্ষা হাইব্রিড ভুট্টার জাত ২-৩ গুণ বেশি ফলন প্রদান করতে সক্ষম হয়। ধান এবং গমের তুলনায় অধিক লাভজনক হওয়ায় ভুট্টা চাষ সহজেই কৃষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। দেশের বাইরে থেকে হাইব্রিড ভুট্টার বীজ আমদানী করে তখন থেকে হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ এদেশে শুরু হয়ে যায়। বাংলাদেশে হাইব্রিড ভুট্টার আবাদী এলাকা ও ফলন দু'টোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভুট্টা আবাদে চাষে ১০০ ভাগ হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ এবং সময় মতো ও সঠিক পরিচর্যা ভুট্টার ফলন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের ভুট্টার হাইব্রিডের চাহিদা কিয়দংশ মাত্র পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে বিধায় বিদেশ থেকে

আমাদের ভুট্টার অধিকাংশ হাইব্রিড বীজ আমাদানী করতে হচ্ছে। এসব আমদানীকৃত হাইব্রিড জাত এদেশের জল-হাওয়া-মৃত্তিকায় বেশ ভালোই অভিযোজন ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে বলেই বিদেশী জাতগুলোর বীজ আমদানী করে আমরা ভুট্টার ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ব্র্যাক CIMMYT-এর সহযোগিতায় এদেশে ভুট্টা গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০০৮ সন নাগাদ ব্র্যাক উত্তরণ এবং উত্তরণ-২ নামক দু'টি হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করে। মানুষের খাবার উপযোগী সাদা ভুট্টার জাত উদ্ভাবনের গবেষণাও এগিয়ে চলছে ব্র্যাক বিজ্ঞানীদের সহায়তায়। তাছাড়া হাইব্রিড জাত উৎপাদন কলা কৌশল নিয়েও কাজ করে চলেছে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বীজ কোম্পানী।

সরকারী এবং বেসরকারী উভয় সেক্টরেই দেশে অল্প পরিমাণ হাইব্রিড ভুট্টার বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। বিএডিসি বারি হাইব্রিড ভুট্টা ৩ ও ৫ জাত দু'টির অল্প পরিমাণ হাইব্রিড বীজ (১০০-১৫০ মেট্রিক টন) তৈরি করছে কয়েক বছর ধরে। দেশে ৪৫০০ মেট্রিক টন হাইব্রিড ভুট্টা বীজের চাহিদা থাকায় বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বীজ কোম্পানী বারি উদ্ভাবিত হাইব্রিড বীজ তৈরির উদ্যোগ নেয় বটে তবে তা খুব একটা কৃতকার্য হয়নি। বিদেশ থেকে আমদানী করে আনা হাইব্রিড ভুট্টার ফলন আমাদের নিজস্ব জাত অপেক্ষা অধিক। তাছাড়া স্থানীয় ভাবে বীজ উৎপাদন করলে উৎপাদন ব্যয়ও অধিক হয়। আর হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবতো রয়েছেই। দেশে ২০০৬-০৭ সনে ৪০০০ মেট্রিক টন হাইব্রিড ভুট্টার বীজ বাজারজাত করা হয় যার মধ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজের পরিমাণ মাত্র ১৩০০ মেট্রিক টন। মুরগীর খামারে মুরগীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ভুট্টার বীজের চাহিদা খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। তবে এ অবস্থার উন্নতি ঘটলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার বলবৎ থাকলে আগামী ২০১৫, ২০২০ ও ২০৩০ সনে বাংলাদেশের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৫৬.৭, ১৬৬.৯ এবং ১৯০.৬ মিলিয়নে। সে সময় ভুট্টার চাহিদা হবে যথাক্রমে ২.২৫, ৩.০০ এবং ৩.৫০ মিলিয়ন টন। এই সময়কালে যদি ভুট্টার আবাদি এলাকা যথাক্রমে ০.৩০, ০.৩৫ এবং ০.৪০ মিলিয়ন হেক্টরে উন্নীত করা যায় তবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়াতে পারে যথাক্রমে ২.২৫, ২.৮০ এবং ২.৯৭ মিলিয়ন টনে। এই লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলেও কিন্তু আমাদের চাহিদা মেটাবার জন্য বিদেশ থেকে ভুট্টার দানার আমদানী অব্যাহত রাখতে হবে।

ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে নানা দিকে। বিদেশ থেকে আমদানী করা কোন কোন হাইব্রিড ভুট্টার ফলন আসলেই হেক্টর প্রতি ৭-৮ টন। এ কারণে অধিক অর্থ ব্যয় ঘটলেও বিদেশ থেকে আমদানী করা হাইব্রিড বীজের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ অধিক। বীজ কোম্পানীগুলোর সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসব বিদেশী হাইব্রিড জাতের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে আমাদের বিজ্ঞানীদের আরও অধিক ফলনশীল হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করতে হবে। অধিক ফলনশীলতার পাশাপাশি আরও অন্যান্য বিষয়ও বিজ্ঞানীদের ভাবতে হবে। ভুট্টার আগাম প্রকৃতির অধিক ফলনশীল মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন হাইব্রিড জাত আমাদের প্রয়োজন। তাছাড়া প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের বিষয়টিও ভাবতে হবে বিজ্ঞানীদের। ভুট্টার বীজ সংগ্রহ পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়গুলো নিয়েও আমাদের আরও মনোযোগ দিতে হবে। ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নানা লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য আমাদের গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে। আমাদের হাতে এখন বিদেশের অনেক ভালো ভালো হাইব্রিড জাত রয়েছে। এসব জাতগুলোকে ইনব্রেডিং করেও পাওয়া সম্ভব নতুন নতুন উন্নততর ইনব্রেড লাইন যাদের হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া ইনব্রেড লাইন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েও অধিক ফলনশীল ভুট্টার জাত স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব।

হাইব্রিড সজি

পৃথিবী জুড়ে হাইব্রিড সজির কদরই আলাদা। হাইব্রিড সজির কদর নানা কারণে। বাঁধাকপি, তরমুজ, পেঁয়াজ আর কুমড়ার বৃহদাকৃতি কিংবা টমেটো, বেগুন, শসা, কুমড়ার অধিক সংখ্যা বা উভয়টিই এসব ফসলে হাইব্রিড জাত সৃষ্টির মূল কারণ। পেঁয়াজ, বাঁধাকপির সমরুপতা; পেঁয়াজের ক্ষেত্রে একসঙ্গে পরিপক্কতা; বাঁধাকপি, তরমুজ, বাঙ্গি, পেঁয়াজ, টমেটো বা বেগুনের আগাম পরিপক্কতা এবং প্রতি একক ক্ষেত্রে বাঁধাকপি বা পেঁয়াজের বৃহদাকৃতির মাথা (Head) বা কন্দ উৎপাদনও সম্ভব হয় হাইব্রিড জাত তৈরির মাধ্যমে। অধিক রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, অধিক খরা সহিষ্ণুতা, ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে উত্তম অভিযোজনও কোন কোন সজির হাইব্রিড জাত সৃষ্টির মূল লক্ষ্য।

আমাদের বাজারে এখন 'হাইব্রিড' ল্যাবেলযুক্ত বিভিন্ন সজির বীজের অভাব নেই। বীজ নীতির উদারতার কারণে সহজেই বীজ ব্যবসায়ীদের যেকোন দেশ থেকে বীজ আমদানীর অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে। সে সুবাদেই নানা সুদৃশ্য মোড়কে বাজারে এখন হাইব্রিড সজির বীজ বেশ সুলভ। বলাবাহুল্য এসব ল্যাবেলযুক্ত হাইব্রিড বীজের অধিকাংশেরই উদ্ভাবক বাংলাদেশী বিজ্ঞানীরা নন। কেন নন সে কথা পরে বলছি।

বিদেশ থেকে বীজ আমদানীর সুফল কুফল দু'টোই রয়েছে। সুফল এই যে, সহজেই অন্য দেশে সৃষ্ট উন্নত জাতটি আমরা আমাদের দেশে নিয়ে আসতে পারছি। আপাত এই সুফলের আড়ালে কুফল অনেক বেশী বলে মনে হয়। বীজ ফসলের বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণুর একটি উত্তম বাহক। তাছাড়া বীজের মাধ্যমে নানারকম কীটপতঙ্গ সহজেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতে পারে। আমাদের দেশের সঙ্গনিরোধ (Quarantine) ব্যবস্থাপনা এখনও বেশ সেকেলে এবং সুযোগ সুবিধাও বেশ অপ্রতুল। ফলে সুষ্ঠু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এসব হাইব্রিড বা অ-হাইব্রিড বীজ বাজারে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে যাচ্ছে। তাতে আমাদের দেশের সজির জন্য নতুন নতুন রোগজীবাণু ও কীটপতঙ্গ হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অন্যদিকে, এসব অধিকাংশ হাইব্রিড জাত যে পরিবেশের জন্য সৃষ্টি

করা হয়েছে আমাদের দেশের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা জাত উৎপাদক দেশের অনুরূপ নয়। সে কারণে হাইব্রিড জাতের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এছাড়া এসব আমদানী করা বীজ হাইব্রিড জাতের কিনা এবং সেসব জাতই শ্রেষ্ঠ জাত কিনা এসব সন্দেহতো রয়েছেই।

সব্জির হাইব্রিড জাত সৃষ্টি তুলনামূলকভাবে বেশ সহজ। কোন কোন সব্জির চমৎকার লিঙ্গ বহুরূপতা স্বভাব হাইব্রিড জাত সৃষ্টিকে বেশ ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে কুমড়া পরিবারের ফসলের বৈচিত্র্যময় লিঙ্গরূপতা শসা, মিষ্টি কুমড়া, বাঙ্গি বা তরমুজে হাইব্রিড জাত সৃষ্টিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এসব সব্জি ফসলে নানা জাতের ফুল ধরার স্বভাব রয়েছে। কিছু কিছু গাছ রয়েছে যাদের একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদাভাবে তৈরি হয়। কোন কোন সবজি গাছ আছে যারা কেবল স্ত্রী ফুলই তৈরি হয়। কেবল পুরুষ ফুল তৈরি হয় তেমন জাতের গাছও আছে। একই গাছের একই ফুলে স্ত্রী-পুরুষ উভয় জননাঙ্গসমৃদ্ধ উভলিঙ্গি ফুলও পাওয়া যায় কোন কোন জাতে। আবার স্ত্রী ফুল এবং উভলিঙ্গি ফুলও ফুটে কোন কোন জাতে। এই যৌন বৈচিত্র্যতাকে কাজে লাগিয়ে প্রজননবিদগণ এসব ফসলে সহজেই তৈরি করতে সক্ষম হাইব্রিড জাত। এসব ফসলের লিঙ্গরূপতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থও রয়েছে। এদের প্রয়োগ করে এখন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে কেবল স্ত্রী ফুলসম্পন্ন গাছ বা কেবল পুরুষ ফুলসম্পন্ন গাছও। অক্সিন, ইথাইলিন, এসিটাইলিন আর ইথেফোন প্রয়োগ করে পাওয়া সম্ভব স্ত্রী ফুলের প্রাধান্যবিশিষ্ট গাছ। আর জিবেরেলিক এসিড, সিলভার নাইট্রেট, সিলভার থায়োসালফেট ইত্যাদি প্রয়োগ করে পাওয়া সম্ভব পুরুষ ফুল প্রাধান্যবিশিষ্ট গাছ। এসব রাসায়নিক পদার্থের সুষ্ঠু প্রয়োগ হাইব্রিড জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ডকে লাভজনক ও সহজতর করে তুলেছে।

ফসলের হাইব্রিড জাত তৈরি করার জন্য প্রয়োজন দুটি জাত নির্বাচন করা যাদের সংযোগে সৃষ্ট হাইব্রিড উদ্ভিদটি সর্বাধিক ফলন দিতে সক্ষম হবে। ফসলের বংশগতি সম্পর্কীয় নিয়মকানুন জানা বিজ্ঞানীর বড় ভূমিকা কিন্তু এখানটাতেই। এর জন্য দরকার হয় নানা উৎস থেকে সংগৃহীত গাছসমূহের মধ্যে পরস্পর একত্রে সংযুক্ত হয়ে উত্তম হাইব্রিড তৈরির ক্ষমতা আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা। এর একাধিক পন্থা রয়েছে। এসব কৃৎকৌশল কতটা দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব তার উপর পুরো কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভরশীল। একবার প্রত্যাশিত দুটো পেরেন্ট লাইন নির্বাচন করা গেলে হাইব্রিড বীজ তৈরির কাজটি খুব জটিল নয়।

কুমড়া পরিবারের অধিকাংশ ফসলে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদাভাবে একই গাছে ফুটে থাকে। ফলে যে গাছে হাইব্রিড বীজ তৈরি করতে হবে সে গাছের ফুলে আর পুংহীনকরণের প্রয়োজন হয় না। নির্বাচিত পুরুষ গাছের ফুল থেকে পরাগরেণু সংগ্রহ করে তা কৃত্রিমভাবে স্ত্রী গাছের স্ত্রী ফুলে সংযোজন করে দিলেই পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড। স্ব-পরাগায়ন এড়াতে পুরুষ ফুলগুলো শুধু কর্তন করে দিলেই চলে। এক একটি পরাগায়ন যেহেতু প্রচুর সংখ্যক বীজ উৎপাদন করে সেজন্য হাইব্রিড বীজ উৎপাদন খরচ বেশী নয়। শসা, তরমুজ, ফুটি, স্কোয়াশ ও কুমড়াতে এ পদ্ধতি সহজেই প্রয়োগ করা যায়।

এর বিকল্প পদ্ধতিটি হলো স্ত্রী গাছ হিসেবে নির্বাচিত গাছের পুরুষ ফুল কর্তন করে দিয়ে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন সম্পন্ন করা। এরজন্য পাশাপাশি স্ত্রী ও পুরুষ গাছ এমনভাবে লাগাতে হবে যেন সহজেই কীটপতঙ্গ স্ত্রী ফুলে পরাগ বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুরুষ ফুল অবশ্যই ফোটার পূর্বে কুঁড়ি অবস্থায় অপসারণ করে দিতে হবে। কেবল স্ত্রী গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে হাইব্রিড বীজ পাওয়া যায়। কোন একটি পৃথক স্থানে স্ত্রী গাছ এবং পুরুষ গাছের সারি পর্যায়ক্রমিকভাবে লাগিয়ে হাইব্রিড বীজ তৈরি করা যায়। শসা, তরমুজ, ফুটি, স্কোয়াশ ও কুমড়াতে এভাবে হাইব্রিড বীজ তৈরি করা হয়।

সবজির হাইব্রিড বীজ তৈরির নানা রকম কৌশল রয়েছে। টমেটো, বেগুন, মরিচ এবং ফুটিতে হাত দ্বারা ফুল পুংহীনকরণ করে হস্ত পরাগায়ন সম্পন্ন করে পাওয়া যায় হাইব্রিড বীজ। শসা, তরমুজ, লাউ, মিষ্টি কুমড়া আর স্কোয়াশের ক্ষেত্রে শুধু কৃত্রিম পরাগায়ন করে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। অবশ্য তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াশ ও শসায় হস্ত পুংহীনকরণ বা পুরুষ ফুল কর্তন করে রেখে দিলে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন নিস্পন্ন করে হাইব্রিড বীজ পাওয়া সম্ভব। পালংশাক আর মিষ্টি মটরে বায়ু পরাগায়নই যথেষ্ট। কপি পরিবারের ফসলে স্ব-অসংগতি স্বভাবের ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং পেঁয়াজ, গাজর এবং মূলায় পুংবন্ধ্যাত্ব স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে অবাধ কীট পতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন সম্পন্ন করে হাইব্রিড বীজ তৈরি করা যায়।

কুমড়া পরিবারের অধিকাংশ সজি একবাসী প্রকৃতির। অর্থাৎ এদের একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদাভাবে জন্মে। বিজ্ঞানীরা নিরাপদ মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে এ ধরনের ফসলের পুরুষ ফুল উৎপাদন কয়েক সপ্তাহ বন্ধ রাখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাতে করে গাছগুলোতে কিছুদিন কেবল স্ত্রী

ফুলই ফুটে। এরকম স্ত্রী গাছের পাশে লাগানো প্রত্যাশিত পুরুষ ফুলের পরাগরেণু দিয়ে অতঃপর স্ত্রী ফুলগুলো নিষিক্ত করা হলে পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড বীজ। গাছের প্রথম প্রকৃত পাতা পর্যায়ে ২৫০ পিপিএম ইথেফোন গাছে স্প্রে করে দিলে কোন কোন কুমড়া পরিবারের সব্জিতে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত পুংফুল ধরা বন্ধ থাকে। তবে ৬০০ পিপিএম মাত্রায় ইথেফোন গাছে ২ এবং ৪ পাতা পর্যায়ে দুবার প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ পুষ্পায়ন পর্যায়েই পুরুষ ফুল উৎপাদন বন্ধ থাকে। এ সুবিধা কাজে লাগিয়েও কুমড়া পরিবারের সব্জিতে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন সম্ভব।

কুমড়াজাতীয় ফসলে আজকাল শুধু স্ত্রীজাতীয় গাছ সৃষ্টি এবং তা রক্ষনাবেক্ষণ করে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। সব্জিতে এ ধরনের স্ত্রী গাছ পেলে রাসায়নিক পদার্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে স্ব-পরাগায়ন সম্পন্ন করা এবং স্ত্রী গাছটিকে বংশ পরম্পরায় রক্ষা করা সম্ভব হয়। স্ত্রী গাছে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় জিবেরেলিক এসিড, সিলভার নাইট্রেট বা থায়ো সালফেট প্রয়োগ করে সাময়িকভাবে পুরুষ ফুল পাওয়া সম্ভব যা দ্বারা স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন সম্পন্ন করে স্ত্রী গাছ থেকে বীজ উৎপাদন করা যায়। অতঃপর ঐ স্ত্রী জাতের গাছের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত পুরুষ জাতের গাছ লাগিয়ে এবং পর-পরাগায়ন নিশ্চিত করে পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড বীজ।

কপি পরিবারের কোন কোন সব্জি যেমন- বাঁধাকপি বা ব্রাসেলস্ স্প্রাউটে স্ব-পরাগায়ন অক্ষমতা বা স্ব-নিষিক্ত না হওয়া স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে হাইব্রিড জাত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। স্ব-পরাগায়নে অক্ষর স্বভাবের দুটি জাত পাশাপাশি লাগালে যে বীজ পাওয়া যাবে তা অবশ্যই হবে হাইব্রিড প্রকৃতির। স্ব-পরাগায়ন সংঘটিত হয়না বলে পর-পরাগায়ন ছাড়া এ ক্ষেত্রে বীজ তৈরির কোন সুযোগই নেই। হস্ত পরাগায়ন বা কীট পতঙ্গের সাহায্যে পর-পরাগায়ন সম্পন্ন করা যায়। কোন কোন কপি পরিবারের সব্জিতে অবশ্য পুং বন্ধ্যাত্ব (Male Sterility) ব্যবহার করেও হাইব্রিড বীজ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

টমেটো এবং বেগুনে হস্ত পরাগায়ন করে লাভজনকভাবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। এক একটি ক্রসিং যে ফল উৎপাদন করে তা অনেক বীজ ধারণ করে বলে টমেটো ও বেগুনের ফুলে পুংহীনকরণ ও হস্ত-পরাগায়ন লাভজনক বলেই বিবেচিত। টমেটোর এক একটি ফলে গড়ে ৩০০-এর মত বীজ থাকতে পারে। বেগুনের ফলে বীজের সংখ্যা হতে পারে আড়াই হাজার পর্যন্ত। এসব সব্জিতে কাঙ্ক্ষিত পেরেন্ট নির্বাচন করে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে মাঠে জন্মালে হস্ত পুংহীনকরণ ও হস্ত পরাগায়ন সম্পন্ন করে পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড বীজ। কিছু দক্ষ শ্রমিককে এ

কাজ দু'টো ভাল ভাবে শিখিয়ে দিলে পুংহীনকরণ ও পর-পরাগায়ন সম্পন্ন করে পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড বীজ।

ধানের তুলনায় অনেক সহজ সব্জির হাইব্রিড জাত ও হাইব্রিড বীজ তৈরি করা। বিশেষ করে কুমড়া পরিবারের সব্জির লিঙ্গ বহুরূপতা এবং এদের এক একটি ফলে উৎপাদিত হাইব্রিড বীজের অধিক সংখ্যা এসব সব্জি ফসলে হাইব্রিড জাত উৎপাদনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আমাদের দেশে পাবলিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে সব্জি ফসলে হাইব্রিড জাত তৈরি না হবার রহস্য অন্যখানে। সব্জি গবেষণায় উদ্ভিদ প্রজননবিদদের নিয়োগ না করার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারণে সব্জিতে কেবল হাইব্রিড জাত তৈরি নয় বরং সব্জি ফসল উন্নয়নে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। অথচ অল্প কয়েকজন প্রজননবিদের প্রচেষ্টায় প্রাইভেট বীজ কোম্পানী লাল তীর বীজ কোম্পানী লিমিটেড অল্প কয়েকবছরে তৈরি করেছে বেশ ক'টি হাইব্রিড সবজি জাত।

সব্জির হাইব্রিড জাতের সর্বত্রই কদর রয়েছে। আমাদের দেশেও সব্জি চাষীরা হাইব্রিড ল্যাবেলযুক্ত বিদেশী বীজের প্রতি বেশ আগ্রহী। এসব বীজের দামও বেশ চড়া। কিন্তু ফলন সকল ক্ষেত্রে ভাল নয় বলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হন। আমাদের পরিবেশে হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করতে পারলে কৃষককে আর প্রতারণার শিকার হতে হবে না। সব্জির চমৎকার লিঙ্গরূপতা কৌশল ব্যবস্থাপনা করে আমাদের দেশে সব্জির সংকর জাত সৃষ্টি হবে- আমরা এ প্রত্যাশা করছি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের একটি ফলিত কৌশলের সুফল আমাদের ফসলের মাঠে ঠাঁই পাবে সেটি আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

হাইব্রিড ফুল

দিন দিন ফুল আমাদের প্রিয়তর হয়ে উঠছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা যে মানুষের নান্দনিক চাহিদা সৃষ্টি করে প্রাত্যাহিক জীবনে নানা প্রয়োজনে ফুলের ব্যবহার সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কোথায় নয় ফুল এখন? অফিস আদালতে ফুল, গৃহসজ্জায় ফুল, সভা-সমিতিতে ফুল, হাসপাতালে ফুল আবার ভালবাসায়ও ফুল। মেয়েদের গলায়, খোঁপায়, হাতে, মাথায়, কপালে দেহের সর্বত্রই ঠাঁই নিয়েছে ফুল। মেয়েদের অঙ্গসজ্জার এক আবশ্যিক উপকরণ হলো ফুল। ফুল ক্রমে সর্বগামি হয়ে উঠছে। ফুলের এ সর্বগামিতা আমাদের আশাবাদী করে তুলছে। কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ নয়। এর বাইরের যে নন্দিত জীবন এ যেন তারই বারতা। ক্রমে সে আহবানে সাড়া দিয়ে আমরা যেন দিন দিন মানবিক হয়ে উঠবার চেষ্টা করছি।

ফুল তার বাহারী বর্ণ, গন্ধ আর সজ্জারীতির কারণে আমাদের এত প্রিয়। সে কারণেই আমাদের প্রত্যাশা নতুন নতুন বর্ণের ফুল। আকার আকৃতির বদল ঘটুক সে রকম প্রত্যাশাও আমাদের রয়েছে। আগের চেয়ে আকারে বড় হবে ফুল, অনেক দিন ধরে গাছে ফুল ধরতে থাকবে, ফুল অনেক বেশি দিন গাছে তার ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে সক্ষম হবে, গাছে বাড়বে ফুলের সংখ্যা আর ফুলে বাড়বে পাপড়ির সংখ্যা, ফুলকে নিয়ে তেমনি কত রকম চাহিদা আমাদের।

মানুষের এ সব চাহিদার খবর সেই কবেই পৌঁছে গেছে বিজ্ঞানীদের কাছে। সে কারণেই শুরু হয়েছে ফুল নিয়ে গবেষণা। তারই ফলশ্রুতিতে তৈরি করা হয়েছে পৃথিবী জুড়ে কত রকমের ফুলের জাত। ফুলের আকর্ষণ আর বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটাতে ফুল চলে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশে। কখনোবা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। বিশ্বায়নের যুগে গবেষণার ফলাফল দ্রুত আজ ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তেমনি চলে আসছে কত কত ফুলের নতুন জাত, কখনওবা চলে আসছে তেমন সব ফুলও যা আগে কখনো আমাদের দৃষ্টিতেই পড়েনি।

বাজারে এখন নানা রকম ফুলের বীজ মিলছে। সুদৃশ্য ফুলের পরিবেশন করা সুন্দর মোড়কে এসব বীজ মানুষ ভালোই কিনছে। পৃথিবী জুড়েই নানা রকমের ফুলের হাইব্রিড জাতের আবাদ করা হচেছ। আমাদের দেশেও দিন দিন ফুলের হাইব্রিড জাতের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। বাড়তি কিছু প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায় বলেই মানুষ পছন্দ করছে হাইব্রিড ফুল। ফুল ভেদে কত ভিন্ন ভিন্ন রকম চাহিদা আমাদের। গাঢ় বর্ণ পেতে হলে হাইব্রিড অন্যতম ভরসা। পিটুনিয়া, বেগুনিয়াতে এ রকম গাঢ় বর্ণ নিশ্চিত জাত উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। ফুল গাছের চারা রোপণ করে ফুল ফোটার জন্য দীর্ঘ পরিচর্যা আর দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে রাজী নন এখন অনেক মানুষ। কতটা আগেভাগে প্রথম ফুল ফুটবে গাছে সে লক্ষ্য নিয়েও তৈরি করা হচ্ছে হাইব্রিড ফুল। একই রকম ফুলের অনেকগুলো গাছ বাগানে ঠাঁই পেলে এরা যেন একই আকৃতির গাছ তৈরি করে আর ফুলগুলো যেন একই রকম হয় এ আকাঙ্ক্ষা মানুষের দীর্ঘ দিনের। গাছগুলো খুব বড় না হয়ে খাটো সাটো ধরনের হবে আর গাছটি ঢিলেঢালা না হয়ে বেশ আটোসাটো প্রকৃতির হবে সেটিও কাম্য আমাদের। গোড়ার দিকে প্রচুর শাখা বের হবে, প্রচুর মুক্ত ফুল ফুটবে, পুষ্পায়ন কালটি লম্বা হবে, ফুলের আকৃতি হবে বড়, ফুলের বর্ণ আর আকার হবে একেবারেই নতুন রকম এমনি কত কত কারণে তৈরি করা হয় ফুলের হাইব্রিড জাত। ফুলের হাইব্রিড জাতের কদর আরও নানা কারণে। ভিন্ন ভিন্ন রকম পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ দক্ষ হাইব্রিড জাতগুলো। রোগ বালাই আর কীট পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও এদের অধিক। যে সব ফুল গাছ বীজ তৈরি করলে অঙ্গজ উপায়ে এদের বংশ বিস্তার করা যায় সেসব ফুলের গাছে হাইব্রিড জাতের রয়েছে বাড়তি কিছু সুবিধা। একবার যৌন মিলন ঘটিয়ে উত্তম হাইব্রিডের সন্ধান লাভ করতে পারলে এর পর অনায়াসে এদের অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার করা সম্ভব বলে বছর বছর পাওয়া সম্ভব হাইব্রিড জাতের বাড়তি সুবিধা। প্রতি বছর হাইব্রিড বীজ কেনার প্রয়োজনও হবে না সেসব গাছের।

ফুলের হাইব্রিড জাত তৈরি করা যায় কিনা সে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই। জার্মানীতে বেগুনিয়া ফুলের হাইব্রিড জাত "প্রাইমা ডোন্না" বাজারজাত করা হয়েছে সেই ১৯০৯ সনে। বেশ আগেভাগে এই জাতটি তৈরি করা হলেও কেমন থেমে যায় হাইব্রিড তৈরির কর্মকাণ্ড এরপর। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ১৯৪২ সনে এসে পিটুনিয়াতে বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্যও একটি হাইব্রিড জাত তৈরি করে জাপানী বিজ্ঞানীরা। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর থেকে অনেক ফুলে হাইব্রিড জাত তৈরি করা হয় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে। এজিরেটাম, এষ্টার, দোঁপাটি, বেগুনিয়া, মোরগঝুঁটি, ডালিয়া, লেভেনচালা, গাঁদা, পিটুনিয়া, পপি, স্ন্যাপ ড্রাগন, লিমোনিয়াম, জিনিয়া এসব ফুলের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করেছে বিজ্ঞানীরা।

লাভজনকভাবে ফুলের হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া এখন মানুষের হাতের নাগালের মধ্যেই। উভলিঙ্গি ফুলের পুরুষ অঙ্গ হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে পরাগায়ন সম্পন্ন করে হাইব্রিড বীজ তৈরি করা হচ্ছে পিটুনিয়া, জেরানিয়ামের মতো বেশ কিছু ফুল গাছে। জিনিয়াতে পুং-বন্ধ্যা স্বভাবটাকে কাজে লাগিয়ে কার্যকরভাবে এবং লাভজনকভাবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য কিছু সাশ্রয়ী এবং যুৎসই প্রযুক্তি এখন বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছে। ফুলের পরাগরেণু সংগ্রহ করার জন্য এক রকম পাম্প উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিম্ন তাপমাত্রায় এখন পরাগরেণু সংরক্ষণ করে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যাচ্ছে। আলট্রা ভায়োলেট আলোর নীচে পরাগধানী রেখে তা থেকে পরাগরেণু সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। পরাগায়ন করার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে এক রকম পরাগ বন্দুক, যা দিয়ে জায়গা মতো পৌঁছে দেয়া যায় পরাগরেনু। তাছাড়া অনেক ফুল গাছের ক্ষেত্রে (যেমনঃ পিটুনিয়া) একটি পরাগায়ন একটি ফলে তৈরি করে বহু সংখ্যক ক্ষুদে ফল। পিটুনিয়াতে ৩০ গ্রাম হাইব্রিড বীজ পেতে হলে ২০০ ফুলে পরাগায়ন করাই যথেষ্ট।

হাইব্রিড ফল বা শাকসবজির প্রতি মানুষের কেমন যেন একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। এদের ভিন্নরকম স্বাদ বা স্বাদের তারতম্যের কারণে কিছুটা কম মূল্যে এদের বিক্রি করা হয়। দেশী জাতের শাক সবজির তুলনায় হাইব্রিড জাতের শাক সবজির প্রায়শ দাম কিছুটা কম। হাইব্রিড ফুলের ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টি একেবারেই তা নয়। ফুল যেহেতু দৈহিক আহারের বিষয়বস্তু নয় সেহেতু মানসিক প্রশান্তি মেটাতে হাইব্রিড ফুলের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ ইতিবাচক। হাইব্রিড ফুলের নানাবিধ বাড়তি গুণাবলীর কারণেই এরা মানুষের চিত্তকে জয় করে চলেছে। অধিক দাম জেনেও তাই মানুষ কিনে নিচ্ছে হাইব্রিড জাতের ফুলের বীজ। মোড়কের

অন্তরালে অন্য রকম বীজ ঢুকিয়ে না দিলে সত্যিকার অর্থে হাইব্রিড ফুল তার আকার আকৃতি, বর্ণময়তা আর দীর্ঘ প্রস্ফুটন কালের জন্য বিখ্যাত।

আমাদের দেশের নার্সারীর মালিকেরা এখন দেশ বিদেশের নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করছে নানা প্রজাতির গাছপালা। নতুন নতুন প্রজাতির গাছপালা ছাড়াও নতুন নতুন জাতের ফুলের প্রতিও তাদের আগ্রহ রয়েছে প্রচুর। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সনাতন জাতের ফুল বীজের পাশাপাশি তাই হাইব্রিড জাতের বীজও তারা আমদানী করছে ইদানিং। আমাদের সৌখিন বাগানবিদ ছাড়াও ফুল চাষীরা এখন হাইব্রিড জাতের বীজ পেতে বেশ আগ্রহী। আমাদের দেশে গাঁদা ফুলের বেশ চাহিদা। যে কোনরকম সাজসজ্জায় এ ফুলটির সর্বাধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। হাইব্রিড গাঁদার ফুল বেশ উজ্জ্বল হলুদ আর আকারে বেশ বড়। গাছে এরা ফুটেও থাকে অনেক দিন ধরে। দোপাটির হাইব্রিড বীজ পাওয়া যায় কোন কোন নার্সারীতে। চাইনিজ এস্টারের হাইব্রিড ফুল বেশ আকর্ষণীয় বলে এদের হাইব্রিড বীজও পাওয়া যায় এখন। জিনিয়া হাইব্রিড গাছ বেশ শক্ত সামর্থ, অধিক সংখ্যায় ধরে বড় বড় সব ফুল। খাটো লম্বা দু'রকমের গাছই রয়েছে হাইব্রিড জিনিয়ার, ফলে হাইব্রিড জিনিয়ার বীজও পাওয়া যায় নার্সারীতে। ফুল অনুরাগী মানুষের হাতে পৌছে দেবার জন্য বীজ ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসছে দোপাটি, মোরগ ঝুঁটি আর ডালিয়ার হাইব্রিড বীজ। একটু বেশী দাম দিয়েই এসব বীজ কিনতে আগ্রহী ফুল প্রেমিকগণ। চিত্ত বিনোদনের জন্য এটুকু বাড়তি মূল্য দিতে অনাগ্রহী নন তারা। শুধু তারা নিশ্চিত হতে চান হাইব্রিড মোড়কে আটা বীজগুলো সত্যি সত্যি হাইব্রিড কিনা। বাজারে যে ভেজাল বীজ নেই তা কিন্তু নয়। মানুষ যে ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করে কোন কোন সময় প্রতারিত হচ্ছেনা তাও কিন্তু নয়। বীজ ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা একটু ভিন্নরকম। এরকম নান্দনিক ও কমনীয় ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তারা বিশ্বাসী হবেন এবং মানুষ যে মোড়ক দেখে হাইব্রিড ফুল বীজ কিনছে তা যেন বাস্তবেই সঠিক হয় সেটি নিশ্চিত করবেন। তাহলে আনন্দের সাথে কিছু বাড়তি মূল্য দিয়ে কেনা বীজ দিয়ে বাড়তি কিছু নান্দনিক চাহিদা পূরণ হবে। তাতে বৃদ্ধি পাবে ফুলের বৈচিত্র্য ও বৈভব এবং তা আমাদের চিত্ত বিনোদনের একটি উত্তম উপায় হয়ে উঠবে।

জি এম ফসল কি ও কেন

এখন থেকে আট দশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ ফসল আবাদের কাজটি শুরু করে। আর তখন থেকেই শুরু হয় ফসলের নানারকম রূপান্তর তথা ফসল উন্নয়ন কার্যক্রম। ফসলের কোষস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত ডি এন এ অণুর মধ্যে সৃষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন নানারকম বৈশিষ্ট্যে যে পরিবর্তন নিয়ে আসতো তার উপর চলতো প্রাকৃতিক আর মানুষের কৃত্রিম নির্বাচন। তাছাড়া ফসলের নিজস্ব কোষ বিভাজন কৌশল ও পর-পরাগায়ন মিলে ফসলের বৈশিষ্ট্যে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতো তার উপরও চলতো প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম নির্বাচন। এভাবে নানা বৈশিষ্ট্য রূপান্তরের মাধ্যমে চলতো আগের দিনের ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। তখনও মানুষ জানতোনা কিভাবে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়, কিভাবেই বা তা পিতামাতা থেকে বাহিত হয় সন্তানে সন্তানে আর কেইবা বহন করে নিয়ে যায় এসব বৈশিষ্ট্য।

গত শতাব্দীর গোড়াতে এসে মানুষ জানতে পারে বংশগতির রহস্য। গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল মটর নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে এ রহস্য উন্মোচন করেন ১৮৬৫ সনে। তাঁর ব্যাখ্যা বুঝতে বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ হওয়ায় বংশগতির রহস্য উন্মোচনে আরও লেগে যায় পঁয়ত্রিশটি বছর। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে এসে বংশগতির সূত্র দু'টি পুনরাবিস্কৃত হওয়ায় ফসল উন্নয়ন এক নতুন মাত্রা পায়। জানা সম্ভব হয় কিভাবে বৈশিষ্ট্য বাহিত হয় পিতামাতা থেকে সন্তানে। কিন্তু তখনও অজানা রয়ে যায় এ সত্যটি কে বহন করে নিয়ে যায় নানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের তথ্যাবলী। অর্থাৎ তখনও অনাবিস্কৃত থেকে যায় ডি.এন.এ.-এর কথা। ১৯৫৩ সনে এসে বিজ্ঞানী ওয়াটসন এবং ক্রিক আবিস্কার করেন ক্রোমোজোমের মধ্যকার ডি.এন.এ. অণুর গঠন রহস্য। এরপর থেকে শুরু হয় ডি.এন.এ নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা। ক্রমে ক্রমে জানা সম্ভব হয় কিভাবে কাজ করে ডি.এন.এ.। জানা সম্ভব হয় এ কথা যে, ডি.এন.এ. এর কার্যকর এক একটি অংশ হল 'জিন'। এসব জিন-ই আসলে নিয়ন্ত্রণ করে যতসব বৈশিষ্ট্য। জানা যায় জিন-এর গঠন এবং জিনের কার্যাবলী সম্পর্কিত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতোমধ্যে

উদ্ভাবিত হয়েছে জিন শনাক্তকরণ আর কর্তন কৌশল। জিনের এক জীব থেকে অন্য জীবে সংযোজন কৌশলও। এভাবে আবিস্কৃত হয়েছে রিকম্বিনেন্ট ডি.এন.এ. প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তারই নাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে যে ফসল তৈরি করা হয় সে ফসলের নাম ট্রান্সজেনিক ফসল। মিডিয়া এ ফসলের নাম দিয়েছে জেনেটিক্যালী মডিফাইড বা জি এম ফসল। বিজ্ঞানীরা একে বায়োটিক ফসল নামেও আখ্যায়িত করেন।

ট্রান্সজেনিক নামটি এসেছে 'ট্রান্সজিন' থেকে। কোন একটি ফসলের নিজস্ব প্রজাতির বাইরে থেকে আহরিত জিনকে ট্রান্সজিন বলা হয়। আর ফসলের দূর সম্পর্কিত প্রজাতি বা অনাত্মীয় কোন প্রজাতি বা পরিবার বা অন্য কোন উৎস থেকে আহরিত ট্রান্সজিন ফসলে সংযোজন করে যে ফসলের জাত তৈরি করা হয় তাকে ট্রান্সজেনিক ফসল বলা হয়। জিন প্রকৌশল পদ্ধতি ব্যবহার করে যেকোন জীব বা অণুজীব থেকে জিন আলাদা করে এখন তা ফসলে সংযোজন করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে ফসলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন বিভিন্ন উৎস থেকে ফসলে সংযোজনের কাজও চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে (সারণি ১)।

প্রচলিত ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্য নেহায়েত কম নয়। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক ফসলের ফলন। প্রচলিত ফসল উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে মূলত একটি প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন ধরনের জাত বা উদ্ভিদসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর সম্ভব হয়। অনেক সময় ফসল উন্নয়নের জন্য কাঙ্ক্ষিত জিন এক প্রজাতির জাতগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ ঐ ফসলের অন্য প্রজাতিতে বা অন্য গণে বা অন্য ফসলের কোন প্রজাতিতে বা গণে ঐ কাঙ্ক্ষিত জিনটি বিদ্যমান থাকলে ফসলের সাথে ঐ প্রজাতি বা গণের উদ্ভিদের যৌন মিলন ঘটানো সম্ভব হয় না বলে, তা আমাদের নির্দিষ্ট ফসলে আহরণ করা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য কিন্তু কোন ফসলের উত্তম জাতে অভাব রয়েছে তেমন বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী একটি বা দু'টি জিন অন্য প্রজাতি বা গণ থেকে আহরণ করা। অনেক বেশি সংখ্যক জিন অন্য প্রজাতি থেকে উত্তম জাতে চলে আসলে ঐ জাতটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে জিন স্থানান্তরের মূল লক্ষ্যই কিন্তু ব্যাহত হয়।

প্রচলিত সংকরায়ন ও পশ্চাৎ সংকারায়ন পদ্ধতি কিন্তু অনেক সময় উত্তম জাতে কাঙ্ক্ষিত জিনের পাশাপাশি ঐ জিনের সাথে যুথবদ্ধ থাকা অন্য জিনকেও উত্তম জাতে নিয়ে আসে। তাছাড়া প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোন কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ বা জাতের সঙ্গে সংকরায়নের ফলে প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হবে কিনা তা একটি সুযোগের ব্যাপার মাত্র। নিশ্চিত করে তা স্থানান্তর প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়।

জিন কর্তনের কাজে কেঁচি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত কতগুলো এনজাইম। এদের প্রতিটি এনজাইম এক একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে ডি.এন.এ-কে কর্তন করতে সক্ষম বলে এসব এনজাইমের সাধারণ নাম হল রেসট্রিকশন এনজাইম। আরও স্পষ্ট করে বললে এর নাম রেসট্রিকশন এণ্ডোনিওক্লিয়েজ। এদের সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে কেটে আলাদা করে নেয়া হয়। কর্তিত জিনটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল তৃতীয় ধাপ। হুবহু জিনটির কপি করা হয়। এ কাজে ব্যাকটেরিয়াকেই মূলত কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভিতরে ক্রোমোজোম ছাড়াও কতগুলো বৃত্তাকার ডি.এন.এ. অণু থাকে। এদের প্লাজমিড বলা হয়। এসব প্লাজমিডের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেটে ফেলে একই স্থানে কাঙ্ক্ষিত জিনটিকে সংযুক্ত করা হয় 'লাইগেজ' নামক একটি এনজাইম দিয়ে। অতঃপর সংযুক্ত প্লাজমিডটিকে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তা কালচার করলে পাওয়া সম্ভব হয় শত শত জিনের কপি।

এভাবে হুবহু জিন তৈরি করার এ পদ্ধতিটিকে বলা হয় জিন ক্লোনিং। উক্ত জিনটিকে আলাদা করে নিয়ে তা প্রবেশ করানো হয় কৃত্রিম ভাবে কাঙ্ক্ষিত ফসলের আবাদকৃত প্রোটোপ্লাস্টে। প্রোটোপ্লাস্ট হল কোষ প্রাচীরবিহীন হালকা আবরণী আবৃত কোষ। জিন সরাসরি নানা ভাবে প্রোটোপ্লাস্টে যেমন ঢুকিয়ে দেয়া যায় তেমনি তা পরোক্ষভাবে কোন বাহকের মধ্যে জুড়ে দিয়েও প্রোটোপ্লাস্টে চালান করে দেয়া সম্ভব। এ কাজটি হল জিন প্রকৌশলের পরের ধাপ। উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে বা উচ্চ বেগে ডি.এন.এ. বা জিনখণ্ডকে প্রোটোপ্লাস্টে অণুপ্রবিষ্ট করে দেয়া সম্ভব। তবে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে বা অন্য কোন বাহকে জিনটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে সে বাহকের মাধ্যমে তা পৌঁছে দেয়া যায় প্রত্যাশিত গাছের প্রোটোপ্লাস্টের ভেতরকার ক্রোমোজোম তথা ডি.এন.এ. এর ভিতরে বেশ নির্বিঘ্নে।

সারণি ১ঃ জিন প্রকৌশল পদ্ধতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরকরণে বিজ্ঞানীরা আগ্রহী

বালাই এবং আগাছা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন আগাছানাশক সহিষ্ণুতা, ভাইরাস প্রতিরোধিতা, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধিতা, ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধিতা, ছত্রাক প্রতিরোধিতা সৃষ্টি	**উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির উন্নয়ন** পুং বন্ধ্যাত্ব এবং হাইব্রিড বীজ উৎপাদন
কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন শৈত্য সংবেদনশীলতার পরিবর্তন, পানি স্বল্পতা সহিষ্ণুতার উন্নয়ন, লবণ সহিষ্ণুতার উন্নয়ন	**পুষ্টিমান উন্নয়ন** উচ্চ মিথিওনিন এবং উচ্চ লাইসিন সমৃদ্ধ বীজ, ভিটামিন সমৃদ্ধ ফসল উদ্ভাবন, তৈল ফসলের গুণমান বৃদ্ধি
ফসল কর্তন পরবর্তী মান উন্নয়ন ফলের পরিপক্কতা বিলম্বিতকরণ, উচ্চ স্টার্চ সমৃদ্ধ গোল আলু, মিষ্টতাসম্পন্ন সব্জি উদ্ভাবন	**আণবিক ফার্মিং** নির্দিষ্ট তৈল, স্টার্চ, প্লাস্টিক, এনজাইম উৎপাদন
	মাটি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন দূষিত মাটি নির্বিষকরণ

প্লাজমিডের মাধ্যমে প্রোটোপ্লাস্টের ক্রোমোজোমে জিন স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি বেশ মজার। প্রোটোপ্লাস্ট বা অন্য কোন কোষের সাথে *Agrobacterium tumefaciens* নামক ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডের যে অংশটি এই ব্যাকটেরিয়াম উদ্ভিদ কোষে সচরাচর পৌঁছে দেয় সে অংশটি কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে প্রত্যাশিত জিনটিকে জুড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর প্রত্যাশিত জিনসমৃদ্ধ প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়াতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। উদ্ভিদ কোষ বা প্লাজমিডের সাথে ব্যাকটেরিয়ার একত্রে কালচার মিডিয়াতে আবাদ করা হয়। ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যায় অবলিলায় কোষ বা প্রোটোপ্লাস্টে। প্লাজমিড এবার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এর মধ্যে জুড়ে দেওয়া জিনকে পৌঁছে দেয় কোষস্থ বা প্রোটোপ্লাস্টের ভেতরে অবস্থিত ক্রোমোজোমের মধ্যে। অতঃপর প্রোটোপ্লাস্ট কালচার করে তৈরি করা যায় ক্ষুদে উদ্ভিদ এবং সে ক্ষুদে উদ্ভিদকে উপযুক্ত পরিবেশে বড় হবার সুযোগ করে দিলে তা রূপান্তরিত হয় পরিপূর্ণ উদ্ভিদে। সে উদ্ভিদে এক সময় ফুল আসে, ফুলের ভেতর থেকে এক সময় বেরিয়ে আসে ফল। আর ফলের জঠরে বেড়ে বর্তে উঠে বীজ। ঐ বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে

নানা কৌশলে পাওয়া আমাদের অতি কাঙ্ক্ষিত জিন। জিনটি আসলে উদ্ভিদের কোষে সংযোজিত হতে পেরেছে কিনা তার একটি প্রাথমিক পরীক্ষা হয়ে যায় উদ্ভিদের কিছু টিস্যু নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। আর সংযোজিত জিনটি ফসলে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হচ্ছে কিনা এবং যে বৈশিষ্ট্যটি পাবার লক্ষ্যে জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কিনা সেটি বোঝা যাবে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ থেকে পাওয়া বীজ উপযুক্ত পরিবেশে বুনে দিয়ে। এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে জানা সম্ভব নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদটি নতুন জাত হিসেব অবমুক্ত করা যায় কিনা সেসব বিষয়। উত্তম জাতে কাঙ্ক্ষিত জিনটির পূর্ণ প্রকাশ ঘটলে এক সময় তা ট্রান্সজেনিক ফসল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নানা প্রক্রিয়া শেষে তখন একে বাণিজ্যিকভাবে আবাদ করার জন্য ছাড় করা হয়।

ফসলের নিজস্ব প্রজাতির বাইরে জীবকূলে যে বিশাল জিনসম্ভার রয়েছে তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা জিন প্রকৌশলের মূখ্য উদ্দেশ্য। এ কৌশল ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত জিন সংযোজন করে ইতোমধ্যে বিভিন্ন রকম ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টি করা হয়েছে। আগাছা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। ফসলের মাঠে আগাছা দমনের জন্য তাই বহু দেশে আগাছানাশক ব্যবহার করা হয়। আগাছানাশক ব্যবহারের একটি সমস্যা হল তা কেবল আগাছা নয় ফসলকেও বিনাশ করে। তাই আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের স্বপ্ন। বিভিন্ন উৎস থেকে জিন সংযোজন করে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন আগাছানাশক প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক ফসল। এসব জিন দু'টি উপায়ের যেকোন একটি উপায়ে কাজ সম্পাদন করে। আগাছানাশক আগাছার যে উপাদানটির সঙ্গে বিক্রিয়া করে আগাছাকে ধ্বংস করে সংযোজিত জিন ফসলের সে উপাদানটিকে পাল্টে দেয় বলে আগাছানাশক ফসলের কোন ক্ষতি করে না। অথবা ফসলে সংযোজিত জিন আগাছানাশককে ভেঙ্গে ফেলে এর বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয় বলে ফসল থাকে অক্ষত ও নিরাপদ। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে সয়াবিন, ভুট্টা ও তুলাতে আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত ইতোমধ্যে বাজারজাত করা হয়েছে (সারণি ২)।

ফসলের আর একটি প্রধান শত্রু হল বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গ। অনেক ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগ না করে ফসল ফলানো এখন একটি অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কীটনাশক প্রয়োগ একদিকে যেমন উপকারী

কীটপতঙ্গের মৃত্যু ঘটাচ্ছে অন্যদিকে তা পরিবেশকে মারাত্মক ভাবে বিষিয়ে তুলছে। এ কারণে কীট প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম ট্রান্সজিন ফসলে সংযোজন করে ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টিও বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। ইতোমধ্যে *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া একপ্রকার টক্সিন সৃষ্টিকারী জিন বিভিন্ন ফসলে সংযোজিত করে ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে গোল আলু, ভুট্টা, তুলাসহ বেশ কিছু ফসলে।

সারণি ২ঃ বাণিজ্যিকভাবে আবাদকৃত ট্রান্সজেনিক ফসল

বৈশিষ্ট্য	ট্রান্সজেনিক ফসল
আগাছানাশক প্রতিরোধিতা	তুলা, সয়াবিন, ভুট্টা
কীট প্রতিরোধিতা	গোল আলু, ভুট্টা, তুলা
ভাইরাস প্রতিরোধিতা	স্কোয়াশ, পেপে
আগাছানাশক + কীট প্রতিরোধিতা	তুলা, সয়াবিন, ভুট্টা
ধীরে ফল পাকা স্বভাব	টমেটো
তেলের গঠন	ক্যানোলা

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক ফসলে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে ভাইরাসের ক্ষতিকারক প্রভাব সর্বাধিক। তাছাড়া কীটপতঙ্গ রোধ করা ছাড়া ভাইরাসের বিপক্ষে নেবার মত কোন ব্যবস্থাপত্র বিজ্ঞানীদের জানা নেই। ফলে ভাইরাস প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক ফসল সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথেষ্ট সাফল্যও অর্জিত হয়েছে এক্ষেত্রে। যেসব জিন ব্যবহার করে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধিতা সৃষ্টি করা হয় এদের উৎসও কিন্তু মূলত ভাইরাসই। যুক্তরাষ্ট্রের ফসলের মাঠে ফলছে ভাইরাস প্রতিরোধী স্কোয়াশ আর পেপে ফসল। পেপের ভাইরাস প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক ফসল এ দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে কোন কোন প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের মাঠে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ পর্যায়ে রয়েছে বহু ফসলের ট্রান্সজেনিক জাত। বার্লি, বিট, শসা, লেটুস, তরমুজ, বাদাম, গোল আলু, সয়াবিন, তামাক ইত্যাদি ফসলের ভাইরাস প্রতিরোধী জাত বাজারজাতকরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক প্রতিরোধী ট্রান্সজেনিক ফসলও তৈরি করেছে উদ্ভিদ প্রজননবিদেরা।

ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্যও উদ্ভাবন করা হচ্ছে বিভিন্নরকম ট্রান্সজেনিক ফসল। সাধারণ টমেটোর জাতগুলো পেকে গেলে খুব নরম হয় বলে এদের পরিবহন করা এবং নাড়াচাড়া করা কষ্টকর। তাছাড়া এদের পেকে যাবার বিষয়টি যদি কিছুদিন প্রলম্বিত করা যায় তাহলে মাঠে এদের রেখে দেয়া যায় আর কিছু বেশি দিন। প্রয়োজনমাফিক এদের সংগ্রহ করাও সুবিধাজনক হয়। এ দু'টো বৈশিষ্ট্যকেই সন্নিবেশ করা হয়েছে ট্রান্সজেনিক টমেটোতে। যে এনজাইমটি টমেটোর পেকে যাবার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তার কর্মকাণ্ডকে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে একটি ট্রান্সজিন টমেটোতে ঢুকিয়ে দিয়ে। টমেটোকে শক্ত রাখার জন্য যখন আমাদের দেশের কোন কোন কৃষক কচি অবস্থায় সংগ্রহ করে বিষাক্ত পদার্থ স্প্রে করে দিচ্ছেন তখন এ ধরনের ট্রান্সজেনিক টমেটোর খবর নিঃসন্দেহে তাদের আশাবাদি করে তুলবে।

ধান পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠির প্রধান খাদ্য শস্য। ধানের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রভাব তাই বিশাল। ধানের বীজে সে কারণেই ভিটামিন 'এ' উৎপাদনকারী বিটা ক্যারোটিন সৃষ্টির জন্য ধানে সংযোজন করা হয়েছে দু'টি জিন। এর একটি জিন এসেছে ব্যাকটেরিয়া থেকে আর অন্য জিনটি এসেছে ভুট্টা ফসল থেকে। ধানের বীজে উৎপন্ন হওয়া জেরানিল জেরানিল ডাইফসফেট নামক রাসায়নিক যৌগটিকে এ দু'টি জিন কর্তৃক সৃষ্ট এনজাইম দ্বারা তিনটি ধাপ এগিয়ে নেওয়ার ফলে এখন ধানের বীজে তৈরি হচ্ছে বিটা ক্যারোটিন। ফলশ্রুতিতে ধানের বীজের বর্ণ হয়ে গেছে ভুট্টার দানার মতো সোনালী। সেই থেকে এ রকম ধানের নাম হয়েছে সোনালী ধান। আমাদের দেশের বিখ্যাত বোরো ধান জাত ব্রি ধান ২৯-এ সংযোজন করা হয়েছে এসব জিন। এসব জি এম ধান দিয়ে চলছে এখন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নানা পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা।

আমাদের কৃষিকে এখন নানা রকম বৈরি পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। দিন দিন লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে উপসাগরীয় অঞ্চলের কৃষি জমিতে। দিন দিন নতুন জমিতে এগিয়ে যাচ্ছে লবণাক্ততা। ফলে এক বিশাল অঞ্চল হয়ে পড়ছে চাষের অনুপোযোগী। দেশের উত্তরাঞ্চলে রয়েছে নানা মাত্রার খরার প্রাদুর্ভাব। তাতেও ব্যাহত হচ্ছে ফসলের ফলন। বাড়ছে উষ্ণতা, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ফসলের

উপর। পাল্টে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতের ধরন ধারণ। তার উপর রয়েছে আকস্মিক বন্যা, জোয়ার ভাটা এমনি কত কি। ফলে আমাদের আজ প্রয়োজন হচ্ছে নানা রকম বৈরি পরিবেশ সহনশীল ফসল। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর বহু গবেষণাগারে জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। লবণাক্ত সহিষ্ণু বা খরা সহিষ্ণু কিংবা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসলের এরকম জাত পেলে তা আমাদের কৃষির জন্য হয়ে উঠবে এক মহা আশির্বাদের বিষয়।

বিচিত্ররকম সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে দিন দিন আবির্ভূত হচ্ছে নানারকম ট্রান্সজেনিক ফসল। বাড়িয়ে দিচ্ছে ফসলের ব্যাপকতা। আলোচনার টেবিলে চলে আসছে এর সুফল কুফল বিতর্ক। ফলে নানা কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এবং লম্বা সময় অপেক্ষার পর মাঠে প্রবেশের ছাড়পত্র পাচ্ছে এসব ট্রান্সজেনিক ফসল। জীব নিরাপত্তা নিয়মকানুন (Bio-safety rules) মেনে নিয়ে তবে মানুষের কল্যাণে এসব ট্রান্সজেনিক ফসল একদিন হয়ত চলে আসবে আমাদের মাঠেও। এর আগে দরকার জীব নিরাপত্তা আইন। দরকার ভৌত ও কারিগরি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি। তার চেয়েও বড় দরকার খোলা মন নিয়ে এর নানা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করা।

সকল প্রযুক্তিরই ভালো মন্দ দু'টি দিক রয়েছে। জিএম ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিটি নতুন বিধায় এটি নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেসব জীবের সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে জিন বিনিময়ের সুযোগ নেই ফসলের সেসব জিন ব্যবহার করে জি এম ফসল সৃষ্টি করার বিষয়টি নৈতিক কিনা এ প্রশ্ন বাদ দিলেও জি এম ফসল নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে মানুষের সামনে। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, যে জীব থেকে জিনটি নেয়া হয় তার সঙ্গে কোনো এলার্জি ঘটাতে সক্ষম তেমন জিনও ফসলে ঢুকে যায় কিনা। অর্থাৎ এসব ফসলের উপাদানের সঙ্গে কোনো এলার্জি উপাদান থেকে যায় কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, আগাছা প্রতিরোধী জি এম ফসল নিয়ে। ফসলের আগাছা প্রতিরোধী জিনটি যদি পর পরাগায়নের মাধ্যমে আগাছার মধ্যে চলে যায় সে আগাছা নির্মূল করা কি কষ্টকর হবে না? তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, কীট প্রতিরোধী জি এম ফসল নিয়ে। যে বিষাক্ত উপাদানটি জি এম কীট প্রতিরোধী ফসলে সৃষ্টি হয় বলে ফসলটি কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী হয়ে থাকে কীটপতঙ্গ যদি সে বিষাক্ত উপাদানের বিপক্ষে প্রতিরোধী হয়ে উঠে তা হলে কি হবে? চতুর্থ প্রশ্নটি হলো, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জি এম ফসল যে কেবল নির্দিষ্ট কিছু কীট পতঙ্গের

ক্ষতি সাধন করে তাতো নয় বরং তা উপকারী কীটপতঙ্গেরও ক্ষতি সাধন করতে পারে। উপকারী কীট পতঙ্গ জি এম কীট প্রতিরোধী ফসল ভক্ষণ করে যদি মারা যায় তবে তাকি পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলবে না? আরও যে প্রশ্ন নেই তা কিন্তু নয়। এসব বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে সজাগ নন তাও নয়। বরং দিন দিন আরও নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে এসব প্রশ্নকে সামনে রেখে। জি এম ফসল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পদ্ধতিও পাল্টাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ এ দুটো বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে জি এম ফসল তৈরি করা হলে এক সময় বহু দেশে শুরু হবে এর আবাদ। জি এম নিয়ে জনমনে যে শঙ্কা তা দূর করার দায়িত্বও কিন্তু বিজ্ঞানীদের। আলাপ আলোচনার আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে জি এম ফসল তৈরি হবে তা হবে জনস্বাস্থ্য সহায়ক এবং পরিবেশ বান্ধব আমরা সেটি প্রত্যাশা করি।

BANSDOC Library
Accession No. 15257

১

জি এম ফসলের হাল হকিকত

পৃথিবী জুড়ে গত তিন-চার দশকের নিরলস গবেষণার ফলে আধুনিক জীব প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। এসব গবেষণা থেকে জিনকে বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। জিনের আণবিক গঠন, জিনের কাজ এবং জিনকে রূপান্তরিত করে নেবার কাজ আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। হাজারো জিনের ভেতর থেকে একটি নির্দিষ্ট জিনকে চিনে নেওয়া, জিনকে কর্তন করা, জিনের সংখ্যাবৃদ্ধি করা এবং জিনকে ফসলের কোষে পৌঁছে দেওয়া এবং কোষকে কৃত্রিমভাবে আবাদ করে তা থেকে ঐ জিন সমৃদ্ধ গাছ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কেবল অনুমানে জিন সংযোজন হয়েছে কিনা তা ধরে নেওয়া নয় বরং জিনটি সত্যি সত্যি ফসলে সংযোজিত হয়েছে কিনা তা জানার কৌশলও বিজ্ঞানীদের হাতে রয়েছে। যে কোন জীবের জিনের গঠন যে এক রকম এবং যে কোন উৎস থেকে জিন কর্তন করে নিয়ে তা ফসলে সংযোজন করে দিয়ে যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব এসব বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন। ফসলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের জন্য এখন কেবল ঐ ফসল প্রজাতির কোন উদ্ভিদ থেকে জিন সংগ্রহ করে নিতে হবে ব্যাপারটি এখন আর এরকম নয়। জীবকূলের যে কোন জীব থেকে জিন কর্তন করে নিয়ে এখন তা ফসলে সংযোজন করা সম্ভব। এরকম দূর সম্পর্কিত বা সম্পর্কহীন কোন জীবের জিন ফসলের ক্রোমোজোমে সংযোজন করে দিয়ে যে ফসল পাওয়া যায় এরই নাম বায়োটিক ফসল বা জেনেটিক্যালী ইঞ্জিনিয়ারড ফসল বা জেনেটিক্যালী মডিফাইড ফসল। মিডিয়াতে সংক্ষেপে একেই বলা হয় জি এম ফসল।

নানা সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ধাপ পেরিয়ে প্রথম জি এম ফসল বাজারজাত করা হয় ১৯৯৬ সনে। সে সময় ১.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জি এম ফসল আবাদ করা শুরু হয়। গত চৌদ্দ বছরে জি এম ফসলের আবাদি এলাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪৮ মিলিয়ন হেক্টরে। এই পরিসংখ্যান থেকে এটি স্পষ্ট দেখা যায় যে, জি এম ফসলের আবাদি এলাকার পরিমাণ বেড়েছে ৮৭ গুণ। ২০১০ সনে পৃথিবীর ২৯টি দেশে জি এম ফসলের বিভিন্ন রকম জাত আবাদ করা হয়েছে। উনত্রিশটি দেশের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার হেক্টর বা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ জমিতে জি এম ফসলের আবাদ করা হচ্ছে মোট সতেরটি দেশে। এ দেশগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল,

আর্জেন্টিনা, ভারত, কানাডা, চীন, প্যারাগুয়ে, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, বারকিনা ফাসো, স্পেন এবং মেক্সিকো। আর পঞ্চাশ হাজার হেক্টরের কম পরিমাণ জমিতে জি এম ফসলের আবাদ করছে বারটি দেশ। এসব দেশ হচ্ছে- কলম্বিয়া, চিলি, হণ্ডুরাস, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যাণ্ড, মিশর, স্লোভাকিয়া, কোষ্টারিকা, রোমানিয়া, সুইডেন এবং জার্মানী (সারণি-১)।

সারণি ১ঃ ২০১০ সনে বিশ্ব জুড়ে জি এম ফসলের আবাদি এলাকা

৫০,০০০ হেক্টর বা এর অধিক জিএম ফসল আবাদকারী দেশসমূহ		৫০,০০০ হেক্টরের নীচে আবাদকারী দেশসমূহ
যুক্তরাষ্ট্র	৬৬.৮ মিলিয়ন	কলোম্বিয়া
ব্রাজিল	২৫.৪ মিলিয়ন	চিলি
আর্জেন্টিনা	২২.৯ মিলিয়ন	হণ্ডুরাস
ভারত	৯.৪ মিলিয়ন	পর্তুগাল
কানাডা	৮.৮ মিলিয়ন	চেক প্রজাতন্ত্র
চীন	৩.৫ মিলিয়ন	পোল্যাণ্ড
প্যারাগুয়ে	২.৬ মিলিয়ন	মিশর
পাকিস্তান	২.৪ মিলিয়ন	স্লোভাকিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা	২.২ মিলিয়ন	কোষ্টারিকা
উরুগুয়ে	১.১ মিলিয়ন	রোমানিয়া
বলিভিয়া	০.৯ মিলিয়ন	সুইডেন
অস্ট্রেলিয়া	০.৭ মিলিয়ন	জার্মানী
ফিলিপাইন	০.৫ মিলিয়ন	
মায়ানমার	০.৩ মিলিয়ন	
বারকিনা ফাসো	০.৩ মিলিয়ন	
স্পেন	০.১ মিলিয়ন	
মেক্সিকো	০.১ মিলিয়ন	

কোন কোন জি এম ফসল এতটাই সফল হয়েছে যে, এরা পৃথিবীর ঐ ফসলগুলোর উৎপাদনে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সাম্প্রতিক কালের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। গত বছরের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে যত সয়াবিনের আবাদ করা হচ্ছে এর শতকরা ৮১ ভাগ হলো জি এম সয়াবিন। জি এম সয়াবিন আবাদ করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা,

প্যারাগুয়ো, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, কোষ্টারিকা ও রোমানিয়ায়। পৃথিবীর আবাদি তুলার শতকরা ৬৪ ভাগ হলো জি এম তুলা। জি এম তুলা আবাদ করা হচ্ছে ১১টি দেশে। দেশগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভারত, চীন, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মায়ানমার, মেক্সিকো এবং কোস্টারিকা। পৃথিবীর শতকরা ২৯ ভাগ ভুট্টা আসলে জি এম ভুট্টা আর ক্যানোলা তেল ফসলের শতকরা ২৩ ভাগই জি এম ক্যানোলা। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী দেশে আবাদ করা হচ্ছে জি এম ভুট্টা। দেশগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন, বারকিনা ফাসো, স্পেন, হণ্ডুরাস, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যাণ্ড, মিশর, স্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া।

আগাছা ফসলের প্রধানতম শত্রুদের একটি। খাদ্য, পানি আর সূর্যালোকের জন্য ফসলের মাঠে আগাছা ফসলের এক শক্ত প্রতিপক্ষ। সে কারণে ফসলের মাঠ আগাছামুক্ত রাখতে কৃষক সদাই তৎপর। পৃথিবীর বহুদেশে শ্রমিকের অভাবে এখন আগাছানাশক প্রয়োগ করে ফসলকে আগাছামুক্ত রাখা হয়। আমাদের দেশেও ইদানিংকালে আগাছানাশকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ফসলের মাঠে আগাছানাশক প্রয়োগের একটি বড় অসুবিধা এই যে, এসব আগাছানাশক আগাছা নির্মূলের পাশাপাশি ফসলেরও কিছুটা ক্ষতি করে থাকে। ফলে ফসল গজাবার আগেই মাঠকে আগাছামুক্ত করার জন্য আগাছানাশক বেশী ব্যবহার করা হয়। আগাছানাশক ব্যবহার করে ফসলের বীজ বুনে দিলেও ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশের নানা পর্যায়ে বেশ কিছু আগাছা কিন্তু মাঠে পরিলক্ষিত হয় যা নির্মূল করার জন্য আগাছানাশক প্রয়োগ করতেই হয়। সেজন্য বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়া থেকে ফসলে এমন জিন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন যা থেকে সৃষ্ট এনজাইম আগাছানাশককে ভেঙ্গে দিতে পারে বা আগাছাকে নির্বিষ করে দিতে পারে। ফলে আগাছা দমনের জন্য ফসলের মাঠে নির্বিঘ্নে আগাছানাশক ব্যবহার করা চলে। আর এ কারণেই বেশ কয়েকটি ফসলে আগাছানাশক প্রতিরোধী জি এম জাত তৈরি করা হয়েছে।

পৃথিবীর সিংহভাগ জি এম ফসল হলো আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল। বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে সেরকম আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলগুলো হলো- সয়াবিন, ভুট্টা, ক্যানোলা, তুলা, সুগারবীট ও আলফা আলফা। পৃথিবী জুড়ে ২০১০ সনে আবাদ করা হয়েছে ১৪৮ মিলিয়ন হেক্টর জি এম ফসল। এর মধ্যে আগাছানাশক প্রতিরোধী সয়াবিনই আবাদ করা হয়েছে মোট ১১টি দেশে যা মোট জি এম ফসলের অর্ধেক আবাদি এলাকা। আগাছানাশক প্রতিরোধী ভুট্টার আবাদ হচ্ছে ৮টি দেশে যা জি এম আবাদি এলাকার শতকরা ৫ ভাগ। অন্যদিকে আগাছানাশক

প্রতিরোধী ক্যানোলার আবাদ হচ্ছে ৪টি দেশে যার আবাদি এলাকা মোট জি এম ফসলের শতকরা ৫ ভাগ।

ফসলের আর একটি প্রধান শত্রু হলো কীটপতঙ্গ। কীটপতঙ্গের আক্রমণে ফসলের ফলন শতকরা ১০-২০ ভাগ প্রতিবছরই হ্রাস পায়। কীটনাশক প্রয়োগ করে কীটপতঙ্গ দমন করা হলেও এরা দীর্ঘ মেয়াদে গাছকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না, ফলে বারবার মাঠে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। এতে পরিবেশ মারাত্মক ভাবে নষ্ট হয় ও জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া কীটনাশকের দাম বেশী হওয়ায় ফসল উৎপাদনের খরচও অনেক বেড়ে যায়। সেজন্য বিজ্ঞানীরা *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে কীটবিনাশী প্রোটিন উৎপাদনে সক্ষম একটি জিন আলাদা করে নিয়ে ফসলের মধ্যে সংযোজন করে দিয়েছে। একে বি টি জিন বলা হয়। আর বি টি জিন সমৃদ্ধ ফসলকে বি টি ফসল বলা হয়। এ জিনের কাজ হলো প্রোটিন তৈরী করা। এ প্রোটিনটি যখন কোন কীটপতঙ্গ গাছ থেকে শুষে নেয় তখন কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রোটিনটি ভেঙ্গে ছোট আকৃতি ধারণ করে তখন এর বিষক্রিয়া শুরু হয় এবং কীটপতঙ্গ মারা যায়। এভাবে ফসল কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। মানুষের দেহে এ প্রোটিনটি অভঙ্গুর থেকে যায় বলে অপরিপাককৃত অবস্থায় তা কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করে মলের সাথে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ বিটি জিন কর্তৃক উৎপাদিত প্রোটিন নির্বাচিত কীটপতঙ্গের ক্ষতিসাধন করলেও মানুষের দেহে এর কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই। এরকম বি টি জিনসমৃদ্ধ ফসল হলো তুলা ও ভুট্টা। কীট প্রতিরোধী বি টি তুলার আবাদ করা হচ্ছে পৃথিবীর ১১টি দেশে। এরা মোট জি এম ফসলের শতকরা ১১ ভাগ। অন্যদিকে বি টি ভুট্টার আবাদ হচ্ছে ১৫টি দেশে। এরা মোট জি এম ফসলের শতকরা ৭ ভাগ দখল করেছে। পৃথিবীর শতকরা ১৯ ভাগ জি এম ফসল হলো একাধিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভুট্টা। আটটি দেশে এদের আবাদ করা হচ্ছে এখন। একাধিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জি এম তুলার ফসলের আবাদ করা হচ্ছে ৬টি দেশে যা মোট জি এম ফসলের শতকরা ২ ভাগ।

পৃথিবী জুড়ে মোট ১২টি জি এম ফসলের বাণিজ্যিক চাষ করা হচ্ছে। এসব ফসল হচ্ছে- সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা, ক্যানোলা, সুগার বীট, আলফা আলফা, পেঁপে, স্কোয়াশ, পপলার, মিষ্টি মরিচ, টমেটো ও গোল আলু। এর মধ্যে ভুট্টার তিন রকম জি এম ফসল রয়েছে। ভুট্টার কিছু জি এম জাত আগাছানাশক প্রতিরোধক্ষম, কিছু জাত আবার কীট প্রতিরোধক্ষম আর অন্য কোন কোন জাতে রয়েছে আগাছানাশক এবং কীট প্রতিরোধী উভয় রকম জিন। তুলাতেও তিন রকম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জি এম জাত রয়েছে। সয়াবিন, ক্যানোলা, আলফা আলফা ফসলেরও জিএম জাত রয়েছে।

সয়াবিন, ক্যানোলা, আলফা আলফা ও সুগার বিট জি এম আসলে আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল। গোল আলুর জি এম ফসল হয় আগাছানাশক প্রতিরোধী নয়তো কীট প্রতিরোধী। পপলারের জি এম ফসলের জাতটি আবার কীট প্রতিরোধী।

দিন দিন একাধিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জি এম ফসলের কদর কিন্তু বাড়ছে। নানা উৎস থেকে বিটি জিন ঢুকিয়ে তৈরি করা হচ্ছে অধিকতর কার্যকর কীট প্রতিরোধী ফসল। এরই সাথে সংযোজন করা হচ্ছে আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন। ফলে একই ফসল একদিকে যেমন কীট পতঙ্গের জাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে তেমনি ফসলের মাঠে আগাছানাশক প্রয়োগ করে আগাছা নির্মূল করা হচ্ছে অথচ ফসল থেকে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অক্ষত।

রোগজীবাণু ফসলের আর একটি অন্যতম শত্রু। কোন কোন রোগজীবাণু ছত্রাকনাশক বা ব্যাকটেরিয়ানাশক প্রয়োগ করে দমন করা সম্ভব হয়। তবে ফসলে ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে গেলে তা আর দমন করার কোন উপায় থাকে না। তাছাড়া ভাইরাসের আক্রমণ কোন কোন ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। বিজ্ঞানীরা তাই ফসলের রোগের মধ্যে ভাইরাসকে প্রতিহত করার কৌশলই প্রথম গ্রহণ করে। যে ভাইরাস ফসলের অধিকতর ক্ষতি সাধন করে সে ভাইরাসের জিন কর্তন করে ফসলের মধ্যে সংযোজন করে দিলে সে ফসল সাধারণভাবে ঐ ভাইরাসের হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পায়। এরকম ভাইরাসের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য ভাইরাস প্রতিরোধী জি এম ফসলের জাত তৈরী করা হয়েছে পেঁপে, মিষ্টি মরিচ আর টমেটোতে।

সবচেয়ে বেশি জিম এম ফসলের আবাদ করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। জি এম আবাদী জমির পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রে ৬৬.৮ মিলিয়ন হেক্টর। ঊনত্রিশটি দেশের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ জি এম ফসলের বাণিজ্যিক চাষাবাদ করা হচ্ছে এখানে। এদেশে আবাদ করা জি এম ফসলগুলোর মধ্যে রয়েছে ভুট্টা, সয়াবিন, ক্যানোলা, তুলা, স্কোয়াশ, পেঁপে, গোলআলু, সুগার বীট আর আলফা আলফা ফসল। জি এম ফসল আবাদের দিক থেকে যথাক্রমে দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলের জি এম ফসল হলো তিনটি- সয়াবিন, তুলা আর ভুট্টা। আর্জেন্টিনাতেও জন্মানো হয় এ তিনটি ফসলই। আবাদী এলাকার ভিত্তিতে চীনের স্থান ষষ্ঠ হলেও ফসলী বৈচিত্র্যের দিক থেকে চীন উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফসলগুলো হলো- তুলা, টমেটো, মিষ্টি মরিচ, পপলার গাছ এবং পেঁপে। ধান এবং ভুট্টা ফসলের জীবনিরাপত্তাজনিত অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে চীনে ২০০৯ এর শেষের দিকে। যে কোন সময় এ দু'টি জি এম ফসলের আবাদ শুরু হবে চীনে।

পৃথিবীর নানা দেশে নতুন নতুন জি এম ফসল আবাদ শুরু করার প্রক্রিয়া চলছে। খরা সহিষ্ণু সয়াবিনের আবাদ শুরু করতে আর বেশীদিন বাকী নেই। ভারতে আর বাংলাদেশে বিটি বেগুনের পরীক্ষা নিরীক্ষাও শেষ পর্যায়ে। চীন দেশে বিটি ধানের পরীক্ষাও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইক্ষু, আঙ্গুর আর কাসাবার জি এম ফসলের মাঠ পর্যায়ের যাচাই বাছাই চলছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এসবের বাইরেও বহু ফসলে বিভিন্ন জীবজ উৎস থেকে জিন কর্তন করে নিয়ে সংযোজন করা হয়েছে অনেক ফসলে। গুণগত মান বৃদ্ধির জন্যও উদ্ভাবিত হচ্ছে নানা রকম জি এম ফসল। রোগ প্রতিরোধক্ষম জি এম ফসলের জাত বাজারজাত করার কর্মকাণ্ডও চলছে পুরোদমে।

জি এম ফসলের জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশেও বিজ্ঞানীরা জি এম উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। জি এম বেগুন আর জি এম গোলআলু নিয়ে গবেষণা চলছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে। আর জি এম ধান নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ। বেগুন ফসলের প্রধান শত্রু হলো 'ফল ও কুঁড়ি ছিদ্রকারী' পোকা। ভারতের বেগুনের জাতে ব্যাকটেরিয়া থেকে বি টি জিন সন্নিবেশন করা হয়েছে। বি টি জিনসমৃদ্ধ ভারতের বেগুনের সাথে আমাদের ৯টি বেগুনের জাতের সংকরায়ন করে বি টি জিনকে আমাদের জাতগুলোতে স্থানান্তর করা হয়েছে। এখন চলছে এসব জাতকে পরিশুদ্ধ করার কাজ। গোলআলুর প্রধানতম রোগ হলো 'বিলম্বিত ধ্বসা' রোগ বা আলুর মড়ক রোগ। Wisconson State University গোলআলুর একটি বুনো প্রজাতি *Solanum bulbocastanum* থেকে মড়ক প্রতিরোধী RB জিন আলাদা করে নিয়ে আবাদী গোলআলুর জাত Katahadin এর মধ্যে সংযোজন করে দিয়েছে। এ জাতটির সাথে আমাদের দু'টি জাতকে সংকরায়ন করে আমাদের জাত দু'টিতে এ জিনটি নিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন চলছে এ জি এম উদ্ভিদগুলোর দক্ষতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক গবেষণার কাজ।

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ধানের জাত ব্রি ধান ২৮ এবং ব্রি ধান ২৯ এর মধ্যে ইরি বিজ্ঞানীরা সংযোজন করেছে ভিটামিন 'এ' তৈরির তিনটি জিন। এসব জি এম উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য আমাদের এই দু'টি জাতের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার পাশাপাশি এর ফলনশীলতা এবং পরিপক্ক বীজে কি মাত্রায় ভিটামিন 'এ' পাওয়া যাবে এসব বিষয় নিয়ে নানা মাত্রিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীগণ। বীজের নিরাপত্তাজনিত নিয়মকানুন মেনেই চলছে এসব গবেষণা কর্মকাণ্ড। সব রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এসব জি এম ফসল এদেশে বাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদ করার প্রসঙ্গটি আসবে।

১

আগাছানাশক প্রতিরোধী জি এম ফসল

আগাছা ফসলের প্রধানতম শত্রুদের একটি। ফসলের মাঠে আগাছা ফসলের এক শক্ত প্রতিপক্ষ। ফসলের সাথে আগাছার প্রতিযোগিতা যেমন মাটির নীচে তেমনি তা মাটির উপরেও। পানির সন্ধানে আগাছা তার মূল পৌঁছে দিতে পারে মাটির বেশ গভীরে। ফসলের মাঠে আগাছার আগ্রাসন উদ্ভিদের পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয়। পুষ্টি উপাদানের জন্যও আগাছা ফসলের অন্যতম প্রতিযোগী। আর মাটির উপরে আলো-হাওয়া এসবের জন্য ফসলের সাথে আগাছার প্রতিযোগিতাতো রয়েছেই। মোদ্দাকথা, ফসলের মাঠে নিয়ন্ত্রণহীন আগাছার উপস্থিতি ফসলের ফলনশীলতা মারাত্মক রকম ব্যাহত করে থাকে।

আগাছার বীজ ফসলের বীজের সাথে মিশে ফসলের বীজের মান নষ্ট করে এবং ফসলের মাঠে আগাছাসমূহ নানারকম কীট পতঙ্গ আর রোগ বালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এ কারণেই ফসলের মাঠে আগাছা নির্মূল করা কৃষকের অন্যতম একটি কাজ। এতদিন আমাদের দেশে শ্রমিক নিয়োগ করে এসব আগাছা নির্মূল করা হতো। দিন দিন শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসল আবাদের খরচও বেশ বেড়ে গেছে। ফলে মানুষ এখন আগাছানাশক প্রয়োগ করে আগাছা নির্মূল করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বেশ কিছু আগাছানাশকের কার্য ক্ষমতা অনেক বিস্তৃত। এরা নানা রকম আগাছার বিরুদ্ধেই কার্যকর। এসব আগাছানাশক তখনই ব্যবহার করা সম্ভব যখন এরা ফসলের তেমন কোন ক্ষতি সাধন করে না।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে আগাছানাশকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর বালাইনাশক প্রশাসন ও মান নিয়ন্ত্রণ শাখা ২২ ধরনের ১২২টি আগাছানাশকের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেছে। আগাছানাশক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ। এরা প্রাণীদেহের চেয়ে উদ্ভিদ দেহে অধিকতর বিষক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে। এর কারণ উদ্ভিদের কোষস্থ বিভিন্ন অঙ্গাণুসমূহে সংগঠিত 'সুনির্দিষ্ট' নানা রকম জীবিয় প্রক্রিয়াকে এরা মূলত বাঁধাগ্রস্থ করে। প্রাণীকোষে সংগঠিত হয় না তেমন প্রাণরাসায়নিক অনেক বিক্রিয়া ও পথক্রম উদ্ভিদ কোষে রয়েছে যা এসব বিষাক্ত পদার্থের প্রধানতম টার্গেট। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার যে কোন এক বা একাধিক ধাপকে টার্গেট করা ছাড়াও

উদ্ভিদের কোষস্থ ক্লোরোপ্লাষ্টে সংঘটিত বহু প্রাণরাসায়নিক কর্মকাণ্ড আগাছানাশকের টার্গেটস্থল হতে পারে। উদ্ভিদ কোষস্থ ভিটামিন ও মানুষের অত্যাবশ্যক এমাইনো এসিড তৈরির পথক্রমের যে কোন স্থানও এদের টার্গেটের বিষয়বস্তু হতে পারে।

আগাছানাশক যেমন মাটিতে প্রয়োগ করা যায় তেমনি এদের সরাসরি গাছের উপরও প্রয়োগ করা হয়। রাসায়নিক প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এরা অজৈব যৌগ বা জৈব যৌগ হতে পারে। জৈব যৌগ আগাছানাশক অধিক ব্যবহার করা হচ্ছে এখন। যেসব আগাছানাশক অধিক বিষাক্ত, ফসলের বীজ রোপন বা বপন পূর্ব অবস্থায় এদের মাঠে প্রয়োগ করা হয়। এরা সব ধরনের আগাছা নির্মূল করে মাঠকে বীজ বপন উপযোগী করে তোলে। মাটিতে এদের প্রভাব কিছু দিন ক্রিয়াশীল থাকে এবং এরা বেশ ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে থাকে। নতুন ফসল রোপনের ঠিক কয়েক দিন আগে যেসব আগাছানাশক ব্যবহার করা হয় এদের কাজও নানা রকম আগাছা নির্মূল করা। এ ধরনের আগাছানাশক সহজেই ভঙ্গুর বলে ফসলের এরা তেমন কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। বীজ গজাবার পর ফসলের মাঠে যেসব আগাছানাশক ব্যবহার করা হয় এরা ফসল সুনির্দিষ্ট ধরনের। নির্দিষ্ট ফসলে নির্দিষ্ট আগাছানাশক ফসলের ন্যূনতম ক্ষতিসাধন করে আগাছাকে নির্মূল করে থাকে। নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের জন্য এ ধরনের সুনির্দিষ্ট আগাছানাশক বাছাই করা হয়। এ ধরনের আগাছানাশক আগাছা আর ফসলে ভিন্ন রকম ক্রিয়া করে এবং ভিন্ন রকম প্রভাব ফেলে। এরা আগাছাকে নির্মূল করলেও ফসল এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

বিভিন্ন দেশের প্রাইভেট কোম্পানী এসব আগাছা নাশক তৈরি করে থাকে। এসব রাসায়নিক পদার্থ বাজারজাত করে মুনাফা অর্জন তাদের একটি অন্যতম লক্ষ্য বলে অনেক সময় আগাছানাশক সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ফসলও এদের প্রয়োগের কারণে নানা মাত্রায় আক্রান্ত হয়।

উদ্ভিদ কোষে ৫০০ থেকে ১০০০ মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে। এসব মাইটোকন্ড্রিয়াতে শ্বসন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। ইলেকট্রন পরিবহন এবং ফসফোরাইলেশন পথক্রম মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঘটে থাকে। আগাছানাশক মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যাবলী ব্যাহত করলে আগাছা মারা যায়। কোন কোন আগাছানাশক সুনির্দিষ্টভাবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংগঠিত বিভিন্ন রাসায়নিক ধাপকে বাধাগ্রস্থ করে বলে আগাছা মারা যায়।

অধিকাংশ আগাছানাশকের কর্মস্থল ক্লোরোপ্লাষ্ট। এদের কোন কোনটা ক্লোরোপ্লাষ্টের গঠন এবং অখণ্ডতা বিঘ্নিত করে। কোন কোনটা আবার আলোক

বিক্রিয়া বাঁধাগ্রস্থ করে, অন্যগুলো আবার সালোকসংশ্লেষণের পথক্রমের নানা স্থানে বিঘ্ন ঘটায় বলে সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়। কোন কোন আগাছা কোষ বিভাজন, নিউক্লিক এসিড পরিপাক এবং আমিষ সংশ্লেষণ বন্ধ করে দেয়। অন্য কোন কোন আগাছানাশক স্নেহজাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ বন্ধ করে দিয়ে আগাছাকে মেরে ফেলে।

আগাছানাশকের কাজ হলো আগাছা নির্মূল করা। অর্থাৎ এদের প্রয়োগের ফলে আগাছার বৃদ্ধি ও বিকাশ রহিত হয় এবং এদের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যুর কর্মকাণ্ডে শুরু হয় উদ্ভিদের কোষস্থ কোন এক বা একাধিক প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার পথক্রম বাঁধাগ্রস্থ করার মাধ্যমে। সব আগাছানাশকের কর্মস্থল ও কর্মপদ্ধতি হুবহু এক নয়। এদের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী এদেরকে বেশ ক'টি মূখ্য রাসায়নিক গ্রুপে ভাগ করা যায়। এদেরকে কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী ১৫টি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তবে অধিকাংশ আগাছানাশকের কর্ম পদ্ধতি প্রায় একই রকম। এরা সাধারণত একটি একক এনজাইম বা প্রোটিন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।

আগাছানাশকের প্রধান উৎস কিন্তু দু'টি। অজৈব পদার্থ সমন্বয়ে উৎপাদিত আগাছানাশককে অজৈব আগাছানাশক বলা হয়। অন্যদিকে জৈব উৎস থেকে উৎপাদিত আগাছানাশককে জৈব আগাছানাশক বলা হয়। উদ্ভিদের কোন অঞ্চলে এরা অধিক ক্রিয়াশীল সেটিও শ্রেণী বিন্যাসের একটি ভিত্তি। এদের কোন কোনটা মূলে অধিক সক্রিয়, তো কোন কোনটা আবার কুঁড়িতে অধিক সক্রিয়। কখন প্রয়োগ করা হয় আগাছানাশক তার উপর এদের নানা ভাবে ভাগ করা হয়। কোন কোন আগাছা বীজ বপন বা চারা রোপনের অনেক আগে, কোন কোনটা আবার বীজ বপন বা চারা রোপনের ঠিক আগে প্রয়োগ করতে হয়। বীজ গজানো বা চারা রোপনের পরবর্তী সময়েও কোন কোন আগাছানাশক ফসলের মাঠে প্রয়োগ করতে হয়। আগাছানাশকের বিষাক্ততার মাত্রা, পরিবেশে এদের স্থায়ীত্ব এবং কত দ্রুত এরা অণুজীবদের কর্মকাণ্ড ভেঙ্গে নির্বিষ হয়ে যায় এসব দিয়েও আগাছা নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

আগাছানাশক যে কেবল আগাছারই ক্ষতি করে তা নয় বরং এরা ফসলেরও নানা মাত্রায় ক্ষতি সাধন করে থাকে। সে কারণেই অধিকাংশ আগাছানাশক ফসলের বীজ গজাবার আগেই মাঠে প্রয়োগ করে আগাছা নির্মূল করা হয়। তারপরও যখন ফসল বেড়ে উঠতে থাকে তখন এর পাশাপাশি আগাছাও গজাতে থাকে। ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশের পর্যায়ে যেসব আগাছা ফসলের মাঠে দেখা দেয় সেগুলো আগাছানাশক দিয়ে নির্মূল করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, কারণ আগাছানাশক ফসলকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে।

আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন ঘটায় এখন যে কোন উৎস থেকে জিন কর্তন করে ফসলে সংযোজন করা যায়। কোন কোন আগাছানাশকের কর্মপদ্ধতি এবং এদের দ্বারা আক্রান্ত প্রাণরাসায়নিক পথক্রম সম্পর্কে অনেক তথ্যই আজ জানা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে নানা প্রকার জীবে আগাছানাশক প্রতিরোধীতার কৌশল জানা সম্ভব হয়েছে। এটাও জানা সম্ভব হয়েছে যে, অনেক আগাছানাশক প্রতিরোধীতা একটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে ফসলে একটি জিন সংযোজন করে ফসলে আগাছানাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব। আর এ ধরনের ফসলে ফসলের যে কোন বৃদ্ধি বা বিকাশের পর্যায়েই আগাছানাশক প্রয়োগ করা সম্ভব। এতে আগাছা নির্মূল হয় কিন্তু ফসল অক্ষত থেকে যায়।

বিদেশে বহু দেশে এখন ফসলের আবাদের কাজটি সম্পন্ন করা হয় যান্ত্রিক উপায়ে। তবে ফসলের মাঠে যান্ত্রিক উপায়ে আগাছা নির্মূল অসম্ভব বিধায় উন্নত দেশের কৃষকদের আগাছানাশকের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক আগাছানাশক আগাছার পাশাপাশি ফসলেরও ক্ষতিসাধন করতে পারে। তাছাড়া কোন কোন আগাছানাশক ফসলের বীজে পৌঁছে গিয়ে সেখানে জমা হতে পারে যা ভক্ষণ করলে মানুষের দেহে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আগাছানাশক নিয়ে কৃষক ও বিজ্ঞানীদের একই রকম আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটা এই যে, এরা যেন সুনির্দিষ্টভাবে আগাছা নির্মূল করতে পারে কিন্তু ফসলের এক ফোঁটাও সমস্যার কারণ না হয়। বাস্তবে বিজ্ঞানীগণ কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে ফসলে জিন সংযোজন করে দিয়ে তাদের সে আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ করেছেন।

আগাছানাশক প্রতিরোধী জি এম ফসলের জাত সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানীদের হাতে তিনটি ভিন্ন কৌশল রয়েছে। কোন কোন আগাছানাশক কোন কোন নির্দিষ্ট প্রোটিনকে আক্রমণ করে বলে আগাছা বা ফসলের মৃত্যু ঘটে। এরকম ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ফসলে এমন জিন সংযোজন করে দেয় যেন সে জিন অনেক বেশি পরিমাণে সে প্রোটিনটি তৈরি করতে পারে। উদ্দেশ্য হলো আগাছানাশক প্রোটিনটিকে আক্রমণ করবে বটে তবে অধিক পরিমাণে প্রোটিনটি তৈরি হওয়ায় ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রোটিনের কোন ঘাটতি দেখা দিবে না। এ জিন আগাছায় থাকবেনা বলে এরা মারা যাবে আর ফসলে থাকবে বলে এরা বেঁচে যাবে। অর্থাৎ ফসলকে অক্ষত রেখেই আগাছা নির্মূল করার জন্য ফসলে আগাছানাশক প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

অনেক আগাছানাশক আগাছার নির্দিষ্ট একটি প্রোটিনকে নষ্ট করে দেয় বলে আগাছার কোষে কোন কোন নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় বলে আগাছা মরে যায়। ফসলেও যদি একই জিন থাকে যা একইরকম প্রোটিন তৈরি করে তবে ফসলও নির্মূল

হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ফসলে এমন একটি জিন সংযোজন করে দেয় যেন তা একটুখানি ভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে যা আগাছানাশক চিনতে ব্যর্থ হয়। এরকম কৌশল অবলম্বন করেও আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম ফসল তৈরি করা হয়েছে।

জীবকূলে এমন জিনের উপস্থিতিও রয়েছে যারা আগাছানাশককে ভেঙ্গে দিয়ে নির্বিষ করে দিতে পারে। আগাছানাশকের বিষক্রিয়াকে নষ্ট করে দিতে পারে তেমন জিন যে কোন জীব উৎস থেকে কর্তন করে নিয়ে ফসলে সংযোজন করাও সম্ভব। এ ক্ষেত্রে জিনের প্রোটিন বা প্রোটিন থেকে পাওয়া এনজাইম আগাছানাশককে ভেঙ্গে নির্বিষ করে দিবে বলে ফসলের মাঠে আগাছানাশক প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। এটিও আগাছানাশক প্রতিরোধী জিএম ফসলের জাত সৃষ্টির একটি চমৎকার কৌশল।

এসব কৌশল প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের প্রথম জাত উদ্ভাবন করেছে এখন থেকে চৌদ্দ বছর আগে। আগাছানাশক প্রতিরোধক্ষম ফসলের জাত বাজারজাত করা হয়েছে সয়াবিন, ভুট্টা, ক্যানোলা, তুলা, সুগারবীট আর আলফা আলফা ফসলে। পৃথিবীর ৮৯.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে এখন এসব ফসল আবাদ করা হচ্ছে। মোট জি এম ফসলের শতকরা ৬১ ভাগই হলো আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত। পৃথিবীতে সয়াবিনের আবাদী এলাকার শতকরা ৮১ ভাগ হলো এ ধরনের জি এম ফসল। আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের কিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে বটে। ফসলের কোন ক্ষতি সাধন না করেই আগাছা নির্মূল করা যায়। ফলে অল্প খরচে কম কষ্টে সহজে আগাছা দমন করে অধিক ফলন পাওয়া সম্ভবপর হয়।

আগাছানাশক প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ কিছু সুবিধা সৃষ্টি করে বটে কিন্তু পাশাপাশি এর ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য নতুন করে কিছু হুমকিও সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, এ ধরনের জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ অধিক পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে। বাস্তবে ঘটছেও তাই। প্রশ্ন উঠেছে আগাছানাশকের জন্যে যেসব জিন ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানুষের জন্য বিষাক্ত কিনা এবং এসব খাদ্য মানুষের এলার্জি সমস্যা সৃষ্টি করে কি-না। আসলে জীবনিরাপত্তাজনিত গাইড লাইন অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে নিরাপদ মনে হলেই কেবল এসব ফসল বাণিজ্যিক আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয় বলে এ ধরনের ঝুঁকি থাকেনা বললেই চলে।

দ্বিতীয়, আগাছানাশক প্রতিরোধিতার জন্য ফসলে যেসব জিন সংযোজন করা হয় ফসলের উপর এগুলোর প্রতিক্রিয়া কি সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

তৃতীয়ত, ফসলের প্রতিটি গাছেরই আগাছানাশক প্রতিরোধীতা থাকায় এসব গাছ নিজেই এক সময় শক্ত আগাছা হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেহেতু নির্দিষ্ট একটি আগাছানাশক এসব গাছের কোন ক্ষতি করতে পারে না ফলে এসব গাছ মাঠে কিংবা বুনো পরিবেশে আগাছা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। তবে আবাদী ফসলের বুনো পরিবেশে টিকে থাকার অন্যান্য গুণাগুণ না থাকায় শুধু আগাছানাশক প্রতিরোধিতার কারণে বুনো পরিবেশে আগাছা হিসেবে টিকে থাকা অনেকটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তবে ফসলের মাঠে অন্য ফসল ফলানোর সময় টিকে থাকা দু'চারটি আগাছা প্রতিরোধী অন্য ফসলের গাছ আগাছা হিসেবে মাঠে টিকে থাকবে।

চতুর্থত, ফসলের মধ্যে সংযোজিত আগাছানাশক জিন পর-পরাগায়নের মাধ্যমে যদি আগাছার মধ্যে চলে যেতে পারে তাহলে আগাছাও আগাছানাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। স্ব-পরাগী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসল থেকে পরাগরেণু মুক্তভাবে উড়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। তাছাড়া জেনেটিক দূরত্বের কারণে আগাছার সাথে ফসলের পরাগায়ন এমনিতেই সহজে হবার কথা নয়। এগুলোর প্রজাতি ভিন্ন, কোনো কোনোটার গণও ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবে এগুলোর মধ্যে ক্রসিং সম্পন্ন হবার কথা নয়। তবে কোনো আগাছার সাথে জিএম ফসলের ক্রসিং ঘটে গেলে কিংবা ফসলের কোনো বুনো আত্মীয়ের সাথে ক্রসিং সম্পন্ন হলে প্রতিরোধী জিনটি আগাছা বা বুনো আত্মীয়ের মধ্যে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আগাছা বা ফসলের আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে আরও শক্ত আগাছা।

পৃথিবীর যে কয়টি দেশে এখন জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ফসলের আবাদ হচ্ছে তার একটি বড় অংশ জুড়ে আবাদ করা হচ্ছে আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসল। ২০০৩ সনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে, মোট ৬৭.৭ মিলিয়ন হেক্টর জিএম ফসলের মধ্যে ৪৯.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আবাদ হচ্ছে এসব ফসল। প্রধান আগাছানাশক প্রতিরোধী ফসলের মধ্যে রয়েছে সয়াবিন, তুলা, ভুট্টা, ধান এবং আর্জেন্টাইন ক্যানোলা। নিয়মিত আমরা যে সয়াবিন তেল ব্যবহার করি তারও একটা বড় অংশ কিন্তু আসে এসব আগাছানাশক প্রতিরোধী জেনেটিক্যালি মোডিফাইড সয়াবিন থেকেই। আমরা আমাদের অজান্তে প্রতিনিয়ত ভক্ষণ করছি জিএম সয়াবিন তেল। এর কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে এখনও তেমন কথা কোথাও শুনিনি।

১

জি এম ফুল

ফুল ভালোবাসেনা এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। ফুলের বাহারি বর্ণ, কাঠামোগত বৈচিত্র্য আর এর আমোদে গন্ধ সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। সেজন্য আনন্দের দিনে যেমন দুঃখের দিনেও তেমনি ফুল আমাদের প্রয়োজনে আসে। বিয়ে হোক, জন্মদিন হোক, কোন আচার অনুষ্ঠান হোক সর্বত্রই ফুলের অসীম রাজত্ব। আজ তাই আনন্দ জানাতে ফুল, প্রেরণা দিতে ফুল, শুভেচ্ছা জানাতে ফুল। আমাদের নান্দনিক চৈতন্যে ফুলের জন্য রয়েছে আশ্চর্য টান। সেজন্যই মানুষ খুঁজে ফেরে আরো ভিন্ন রকম ফুল, ভিন্ন বর্ণের ফুল। কখনো একই ফুলে নানা বর্ণচ্ছটা। কখনো তার চাওয়া একই ফুলের ছোট, বড় আর মাঝারি আকৃতি।

ফুল মানুষ ঘরে রেখে দেয় তার মনোহর রূপ আর গন্ধের জন্য। মানুষ চায় অনেক দিন ধরে সংরক্ষিত থাকুক ফুল ঘরে। অনেক দিন বিলিয়ে যাক তার গন্ধ। নানা বর্ণের ফুলের চাহিদা গোলাপে সৃষ্টি করেছে কতনা বহুরূপতা। নানা আকৃতির ফুলের চাহিদা মেটাতে গাঁদা ফুল আজ কত না আকৃতির পাওয়া যায়। ফুলের গঠন কাঠামো পাল্টাতে, এর নতুন নতুন বর্ণ তৈরির জন্য উদ্ভিদ প্রজননবিদ আর উদ্যানতত্ত্ববিদরা কাজ শুরু করেছেন সেই কবে থেকে। নানা রকম ফুলের জাত সৃষ্টির কাজ চলছে পৃথিবীর নানা দেশে। প্রচলিত পদ্ধতিতে অনেক জাতের ফুলও তৈরি করেছে মানুষ। ফুলের বর্ণ গন্ধ আর আকার আকৃতির জন্য দায়ী নানা উপাদান। প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি উপাদানের রূপান্তর ঘটাতে গেলে প্রায়শই পরিবর্তিত হয়ে যায় অন্য কোনো উপাদান। নির্দিষ্ট করে কেবল বর্ণ, গন্ধ কিংবা কেবল আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো খুবই কষ্ট সাধ্য, কখনো কখনো আবার তা অসম্ভব।

এসব কঠিন আর অসম্ভব কাজকে সহজ করে দিয়েছে আধুনিক জীব প্রযুক্তি। জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ এখন একটি নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করছে অন্য সব গুণাগুণকে অপরিবর্তিত রেখে। কখনও অন্য গাছের জিনকে ঢুকিয়ে দিয়ে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে যাচিত বর্ণ, গন্ধ বা কাঠামোগত বৈচিত্র্য। কখনো এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোন ধাপকে দাবিয়ে রেখে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে বিরল সব বর্ণ। আজ

সম্ভব হয়েছে কমলা রঙের পিটুনিয়া আর নীল বর্ণের গোলাপ তৈরি করা। আণবিক ফুল প্রজনন কেবল যে ফুলের এসব চিরায়ত বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে, তাই নয় আজ ফুল গাছ হয়ে উঠছে নানা রকম কীটপতঙ্গ ও রোগজীবাণু প্রতিরোধী। বর্ণ বৈভবের পাশাপাশি পাল্টে যাচ্ছে আজ ফুলের পাপড়ির সজ্জারীতি। গন্ধহীন ফুল হয়ে উঠেছে সুগন্ধময়ী। এমনকি পাল্টে যাচ্ছে ফুলের সংরক্ষণ কালও।

ফুলের বর্ণ মূলত নির্ধারিত হয় বর্ণিল এ্যান্থোসায়ানিন যথা-হলুদ বর্ণের চালকন, নীল এবং রক্তাভ বর্ণের ডেলফিনিডিন, লাল বর্ণের সায়ানিডিন, কমলা বর্ণের পেলারগুনিডিনস দ্বারা এবং বর্ণহীণ ফ্লেভানোন ও নারিনজেনিন এর আপেক্ষিক উপস্থিত দ্বারা। বর্ণিল এ্যান্থোসায়ানিন সংশ্লেষণের ধাপগুলো এখন জেনে গেছে বিজ্ঞানীরা। ফিনাইলএলানিন দিয়ে শুরু হওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার নানা ধাপ অতিক্রম করতে করতে তৈরি হয় ইট লাল/কমলা, লাল, বেগুনি/নীল বর্ণের ফুল। এসব বিক্রিয়ার ধাপ অতিক্রম করতে প্রয়োজন হয় নানা রকম এনজাইমের। বিভিন্ন প্রকার জিন ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় এসব এনজাইম। এ্যান্থোসায়ানিন জীবসংশ্লেষণ পথক্রমের এক বা একাধিক ধাপের জিনের প্রকাশকে অবদমন করতে পারলে তৈরি হতে পারে নানা রঙের ফুল। ফুল গাছের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট জিন অন্য উৎস হতে সংগ্রহ করে নিয়ে ফুল গাছে সংযোজন করে দিয়ে বদ্ধ করা সম্ভব হতে পারে যে কোন এক বা একাধিক জিন জেয়াকে। এভাবে পাল্টে ফেলা যেতে পারেফুলের বর্ণ আবার কোনো বর্ণের গাঢ়তর প্রকাশ চাইলে বর্ণটির জন্য দায়ী জিনকে অতি প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে তা করা সম্ভব হতে পারে। ভিন্নতর কোনো বর্ণের জন্য জিন ফুল গাছে প্রবেশ করিযে দিয়ে পাওয়া যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন বর্ণের ফুল।

নানা রকম এ্যান্থোসায়ানিন জীবনসংশ্লেষণ নিশ্চিত করা গেলে ফুল গাছে তৈরি হয় নানা বর্ণের ফুল। সাদা ফুল তৈরি করার জন্য তাই এ্যান্থোসায়নিন উৎপাদন বন্ধ করাটাই জরুরি। এ্যান্থোসায়ানিন দ্বারা কোনো বর্ণ সৃষ্টির পূর্বেই যদি বিক্রিয়াটিকে থামিয়ে দেয়া যায়, তাহলেই পাওয়া সম্ভব সাদা ফুল। পিটুনিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকাসহ বেশ কিছু ফুল গাছে জিন প্রকৌশল পদ্ধতি ব্যবহার করে পাওয়া গেছে ধবধবে সাদা ফুল।

এ্যান্থোসায়ানিন উৎপাদন বন্ধ করার জন্য চালকন সিনথেজ জিনের পরিবর্তে ফুল গাছে সন্নিবেশ করা হয়েছে অন্য আর একটি জিন। এর ফলে কমে গেছে ফুলের

বর্ণিলতা এবং গুণ। পিটুনিয়াতে সাধারণত কমলা রঙের ফুল সৃষ্টি হয় না। ভুট্টার একটি জিন পিটুনিয়াতে সংযোজন করে পাওয়া গেছে ইট লাল থেকে কমলা রঙের ফুল। এসব ফুল গাছ থেকে বাছাই করে পাওয়া গেছে কমলা রঙের পিটুনিয়া ফুল। নেদারল্যাণ্ডের গবেষকরা উজ্জ্বল কমলা রঙের পিটুনিয়া ফুল গাছের বাণিজ্যিক আবাদ নিশ্চিত করেছে। চন্দ্রমল্লিকায়ও উজ্জ্বল কমলা রঙের ফুল তৈরির কাজ এগিয়েছে বহুদূর।

ফুল গবেষকদের একটি বড় চাহিদা হলো নীল ফুল তৈরি করা। ফুলের নীল বর্ণ সৃষ্টি হয় যদি এতে এ্যান্থোসায়ানিন ডেলফিডিন বিদ্যমান থাকে। তবে নীল বর্ণ সৃষ্টির জন্য অন্যান্য সহরঞ্জকেরও ভূমিকা রয়েছে। যে ফুল গাছ ডেলফিডিন তৈরি করতে পারে না, সে গাছ নীল ফুলও তৈরি করতে পারে না, কারণ এসব ফুলের গাছে একটি নির্দিষ্ট এনজাইম তৈরি হয় না। নির্দিষ্ট এনজাইমের জন্য জিন আলাদা করে নিয়ে ফুল গাছে জিন সংযোজন করে পাওয়া যেতে পারে নীল ফুল।

ফুলের গন্ধ মানুষকে আকুল করে। গন্ধযুক্ত গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, টিউলিপ বা অর্কিড পেতে কার না মন চায়। অনেক ফুলের গন্ধ না থাকলেও রয়েছে মনোহর রূপ। এর মনোহর রূপের সঙ্গে একটুখানি সুগন্ধ যোগ করা গেলে এসব ফুলের মূল্য আরও বেড়ে যাবে। কাজটি যে সহজ তা কিন্তু নয়। এ যাবৎ অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই। আজ এ বিষয়ে সফল না হতে পারলেও পুষ্প বিজ্ঞানীরা এ রকম লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ফুলের গন্ধ একটি জটিল বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে অনেক উদ্বায়ী অ্যারোমেটিক যৌগ। এসব রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনের পথপরিক্রমা এখনো জানা হয়নি বিজ্ঞানীদের। গন্ধ প্রদায়ী এসব কিছু কিছু যৌগ উপাদানের উপায় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন টারপোনয়েড নামক একটি গন্ধ প্রদায়ী যৌগ থেকে। এর উৎপাদনের উপায় এখন জেনে গেছে বিজ্ঞানীরা। এ ক্ষেত্রে যেভাবে অগ্রগতি হচ্ছে এক দশকের মধ্যে গন্ধহীন অনেক ফুল হয়ে উঠবে গন্ধযুক্ত এমনটি আশা করা যায়।

ফুলের মূল কাঠামোটি পরিবর্তন করার জন্যও আজকাল জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। পাপড়ি হলো ফুলের প্রধান আকর্ষণ। পাপড়ির আকার আকৃতিতে নানা রকম পরিবর্তন এনে ফুল উন্নয়নে আজ নতুন মাত্রা যোগ হতে যাচ্ছে। কত বড়

হবে পাপড়ি অথবা কতটা ছোট হবে। কতটা বৃত্তে সজ্জিত থাকবে পাপড়িগুলো অথবা কি হবে পাপড়ির বিন্যাস এসব এখন গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল এখন কাজে লাগাতেও শুরু করেছে বিজ্ঞানীরা। এখন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে নানা ধরনের পাপড়ি সজ্জা বিশিষ্ট নতুন নতুন ফুল। এমনকি পাপড়ির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে ফুলকে আজ আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে চাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। যে গাছে অল্প ক'টি ফুল হতো গাছের শীর্ষে তাকে এখন পাওয়া যাচ্ছে ভিন্নতর রূপে। এখন অনেক দিন ধরে লম্বা হতে থাকবে। আর ফুল ধরতে থাকবে গাছে। অল্প ফুল ধরত যে গাছে এখন তাতে ধরবে অনেক ফুল। এমনিতর নানা পরিবর্তন এখন নিয়ে আসছে বিজ্ঞানীরা।

ফুল দিয়ে যারা ঘর সাজায় কিংবা টবে যারা কাঁচা ফুল সংরক্ষণ করেন, সৌন্দর্য আর গন্ধ উপভোগ করার জন্য তাদের একটি সীমাবদ্ধতা হলো ফুলের সংক্ষিপ্ত সংরক্ষণকাল। অতি অল্প সময়েই শুকিয়ে যায় ফুল, ঝরে পাপড়ি, গন্ধ যায় মিলিয়ে। সে কারণেই জিন প্রযুক্তিবিদদের নজরে এসেছে বিষয়টি। ফুলের বয়োপ্রাপ্তি ঘটায় যে পদার্থ তা হলো ইথাইলিন। বেশ ক'টি জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষে ফুলে তৈরি হয় ইথাইলিন। ইথাইলিন উৎপাদন বন্ধ করা গেলে বিলম্বিত হবে বয়োপ্রাপ্তি হওয়া। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে পেল দুটো এনজাইমের যে কোন একটিকে ঠেকাতে পারলেই বিলম্বিত হবে ফুলের বয়োপ্রাপ্ত হওয়া। এর একটি হলো এসিসি সিনথিজ বা এসিসি অক্সিডেজ। এর সংশ্লেষণ ঠেকাবার জন্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ফুল গাছে একটি জিন। এ জিনটি তৈরি করে একটি বার্তাবাহক আরএনএ যা এর সঙ্গে বেঁধে ফেলে এসিসি সিনথেজ বা এসিসি অক্সিডেজ জিনের বার্তাবাহক আরএনকে। ফলে আর বাহিত হতে পারে না বার্তাটি। এভাবে অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে ইথাইলিন উৎপাদন। অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হচ্ছে ফুল। অস্ট্রেলিয়া আর জাপানে এসব ফুলের আবাদও শুরু হয়ে গেছে।

ফুল উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে মানুষের আপত্তি থাকার কথা নয়। সরাসরি খাওয়া হয় না বলে এর গ্রহণযোগ্যতা অধিক হওয়ার কথা। ফুল প্রেমিকদের জন্য জিন প্রযুক্তি তাই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সবজি বীজ উৎপাদন ও পরাগায়ন

ফুলের প্রতি আকর্ষণ নেই তেমন মানুষের দেখা পাওয়া ভার। মূলত ফুলের মনোহরা গন্ধ আর বর্ণ আমাদের মুগ্ধ করে। এ হলো এক শ্রেণীর ফুল। অন্য শ্রেণীর ফুলও রয়েছে আমাদের চারপাশে। এরা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং বেশ অনাকর্ষণীয়ও বটে। অন্যদের আবার রয়েছে চমৎকার মধুগ্রন্থি। কাব্যের ভাষায় ফুলের বর্ণ আর গন্ধ নিয়ে যত মনোহর পক্তি রচিত হোকনা কেন ফুলের প্রধান কাজ কিন্তু গন্ধ বিলিয়ে আমাদের মুগ্ধ করা নয়। গাছপালাদের নিজস্ব বংশ রক্ষার তাগিদে সৃষ্টি হয় ফুল। ফুলকে তাই গাছের প্রজনন অঙ্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়। যে গাছে ফুল সৃষ্টি হয় না সে গাছে সাধারণত ফলও সৃষ্টি হয় না। আর ফল না হলে তো সবজির বীজ সৃষ্টির কোন প্রশ্নই আসেনা। মূলত ফল আর বীজ সৃষ্টির জন্যই উদ্ভিদে ফুলের সৃষ্টি হয়।

ফুলের চারটি অংশের মধ্যে প্রজননে অংশগ্রহণ করে সরাসরি দুইটি অংশ। এর একটি অংশের নাম স্ত্রী স্তবক এবং অন্যটিকে বলা পুংস্তবক। পুংস্তবকের এক একটি সদস্যের নাম কিন্তু পুংকেশর। পুংকেশর হলো ফুলের পুরুষ অঙ্গ। পুংকেশর একটি সরু দন্ডের মাথায় বহন করে এক একটি পুংরেণু ভর্তি থলে। এর নাম পরাগধানী। অতি ক্ষুদ্র দানাদার এক একটি পুংরেণুর ভেতর ধারণ করা আছে ঐ গাছের যাবতীয় তথ্য। প্রতিটি গাছের মোট ক্রোমোজোমের অর্ধেক সংখ্যক কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় চলে আসে পুংরেণুর ভেতর। এসব ক্রোমোজোমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে গাছপালাদের নানা রকম বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে নানা মাধ্যমের উপর ভর করে এসব পুংরেণু উড়ে যায় এক গাছ থেকে অন্য গাছে। আমাদের অলক্ষ্যে এসব রেণুর মধ্য দিয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে বাহিত হয়ে যায় কত কত জিন। স্ত্রী কেশরের গোলাকার মাথা তথা গর্ভমুন্ডের উপর এসব পরাগরেণু স্থান করে নিলে ঘটে পরাগায়ন। অতঃপর এসব পরাগরেণু সেখানে অঙ্কুরিত হয়। তৈরি করে পরাগনল। এসব নলের ভেতর দিয়ে স্ত্রী কেশরের গোড়ায় ডিম্বাশয়ের ভেতরে এক একটি ডিম্বকে অবস্থিত ভ্রুণথলিতে পৌছে যায় দু'টি পুং-গ্যামেট। তারই একটি গিয়ে মিলিত হয় ডিম্বকোষের সাথে, তৈরি করে জাইগোট এবং কোষ বিভাজিত হয়ে সবশেষে তৈরি করে ভ্রুণ। অন্য একটি পুং-গ্যামেট

ভ্রুণথলির মাঝখানে অবস্থিত দু'টি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে তৈরি করে একটি নিউক্লিয়াস যা বিভাজিত হয়ে তৈরি করে এক একটি সস্য বা অন্তঃ শাঁস। ভ্রুণ আর সস্য মিলে গঠিত হয় বীজ। অনেকগুলো বীজ নিয়ে অতঃপর পুরো গর্ভাশয়টি রূপান্তরিত হয় ফলে।

বীজ আর ফল সৃষ্টির জন্য যে পরাগায়ন অত্যাবশ্যক এটি বোঝা গেল। তবে পরাগায়নের মাত্রার উপর যে সবজির বীজ উৎপাদন তথা ফলন নির্ভরশীল এটিও আমাদের বুঝতে হবে। সে কারণেই বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত এলাকাটি কিন্তু পরাগায়ন সহায়ক হতে হয়। সবজির বীজ ফসলকে অন্যান্য জাত বা সম্পর্কিত জাতের পরাগরেণুর জাত থেকে রক্ষা করতে হয়। অধিক পরাগায়ন নিশ্চিত করার জন্য সর্বোত্তম ফসল ঋতুকে বেছে নিতে হয় এবং সম্ভব হলে পরাগায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হয়। অধিকাংশ ফসলের পরাগরেণু বায়ু, কীট পতঙ্গ বা উভয় ভাবে বাহিত হয়ে থাকে। বায়ু পরাগায়ন সবজি ফসলের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রায়শই অকার্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। সে কারণে বায়ুপরাগী সবজির ক্ষেত্রে বীজ ফসলের মাঠের আকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু প্রবাহের দিকটিকে মাথায় রেখে কিন্তু মাঠের আকৃতি নির্বাচন করতে হয়। বায়ু পরাগী বীজ ফসলের মাঠটির আকৃতি অবশ্যই আয়তকার হবে এবং এর দৈর্ঘ্যটি হবে বায়ু প্রবাহের দিক বরাবর (চিত্র ১)। তাতে করে অধিক সংখ্যক গাছ পরাগায়নের সুবিধা পাবে। বীজ ফসলের মাঠে কীট পতঙ্গ দ্বারা পরাগায়ন অধিক কার্যকর। যেসব ফসলে কীট পতঙ্গ দ্বারা পরাগায়ন ঘটে এদের ফুলগুলো একটি দলে সজ্জিত থাকে অথবা এদের ফুলগুলো আকৃতিতে কিছুটা বড় হয়। কীট পতঙ্গ যেন ভালভাবে এসব ফুল বা ফুল-দলের উপর বসতে পারে সে ব্যবস্থাটি থাকে। অনেক সবজি ফসল আর কীট পতঙ্গের মাঝে পরাগায়নের জন্য শত শত বছর ধরে চমৎকার সহ-অভিযোজন ঘটেছে। একটি কীট এর শরীরে যত পরাগরেণু বহন করে তার দ্বারা একটি ফুলে একাধিক বার বসলে একটি ডিম্বাশয়ের সকল ডিম্বকের নিষেক নিশ্চিত করার জন্য প্রচুর পরাগরেণু পাওয়া সম্ভব হয়।

দিন দিন পরাগায়নকারী কীট পতঙ্গের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। মৌমাছি, ভোমরা পোকা ইত্যাদি কীট পতঙ্গের সংখ্যা নানা কারণেই কমে যাচ্ছে। বন জঙ্গলে বৃক্ষের ডালে মৌমাছি বাসা বাঁধে। সাধারণত দুপুর পর্যন্ত ফসলের মাঠে বিচরণ করে এরা বাসায় ফিরে আসে। বন জঙ্গল নিধন ঘটার পাশাপাশি বাড়ির আশে পাশের বড় বড় বৃক্ষ কর্তনের ফলে এদের আবাসস্থল অনেক কমে গেছে। তার উপর মধু সংগ্রাহকদের নির্বিচার মধু সংগ্রহের অত্যাচারতো রয়েছেই। রয়েছে ফসলের মাঠে নির্বিচার কীটনাশক প্রয়োগের যন্ত্রণা। বিশেষ করে দুপুর একটার ভেতর মাঠে

কীটনাশক ছিটিয়ে দিলে মৌমাছির মত বহু উপকারী কীটপতঙ্গ বিষাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এসব নানা কারণে সবজির মাঠে পরাগায়ন নিশ্চিত করার মতো কীট পতঙ্গের উপস্থিতি প্রায়শই থাকে না। ফলে প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ পরাগায়নের উপর নির্ভর করে সবজির বীজ উৎপাদনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্য সবজি বীজ ফসলের মাঠে পরাগায়ন সহায়ক কীট পতঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে মৌমাছির বাসা স্থাপন বেশ লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

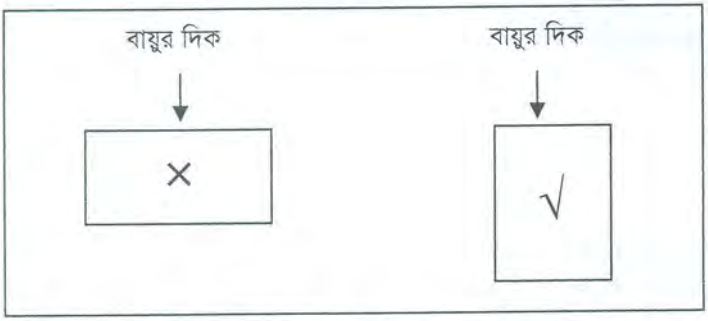

চিত্র ১ ঃ বায়ু পরাগী ফসলে বীজ ফসল উৎপাদনকারী মাঠের আকৃতি

সবজির বীজ উৎপাদনের জন্য পরাগায়ন যে অতি জরুরী তা বেশ বোঝা গেল। তবে সে পরাগরেণুর উৎস কোনটি সেটিও মনে রাখা খুব জরুরী। মুক্ত পরাগী সবজির যে জাতের বীজ উৎপাদনের জন্য এত আয়োজন পরাগরেণুটি কিন্তু সে জাতের হতে হবে। ফসলের অন্য জাত, অন্য সম্পর্কিত প্রজাতির জাত বা বুনো জাতের পরাগরেণুর হাত থেকে বীজ ফসলকে রক্ষা করাও বেশ জরুরী। নানা ভাবে বীজ ফসলের জাতটিকে অন্য জাতের পরাগরেণুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। মাঠের স্থানটিকে পুরোপুরি বিজ্ঞান সম্মত এবং লাভজনক উপায়ে ব্যবহার করতে বীজ উৎপাদনের জন্য একটি চমৎকার পরিকল্পনা থাকতে হবে। সবজি মাঠের ব্যবহার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি অমিশ্রিত গুণগত মানসম্পন্ন বীজ তৈরি করতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সেগুলো হলো-

- **পুষ্পায়ন কালের মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়ে**

একই সময়ে পুষ্পায়ন সম্পন্ন করে সেরকম একাধিক জাত পরস্পর থেকে সময়ের আগপিছু করে মাঠে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন একটির পুষ্পায়ন শেষ হয়ে গেলে আর একটির পুষ্পায়ন শুরু হয়। এভাবে অন্য জাতের পরাগরেণুর হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।

- **বীজ ফসলের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব রক্ষা করা**

একই ফসলের বিভিন্ন জাতের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে সবজির গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা যায়। বাণিজ্যিক বীজ উৎপাদনের চেয়ে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দূরত্ব অধিক রক্ষা করতে হয়। বায়ু পরাগী ফসলের জন্য দূরত্ব ৫০০ মি. হলে ভাল হয়। তবে বায়ু পরাগী ফসলের ক্ষেত্রে ফসলের দু'টি জাতের বীজ উৎপাদন প্লটসমূহ এক অপরের বায়ু চলাচলের দিকে না হলেই উত্তম হয়। কীট পতঙ্গ পরাগী ফসলের ক্ষেত্রে মাঠ যদি ১০০ বর্গমিটারের চেয়ে বড় হয় তবে একটি অপরটি থেকে ২০০ মি. দূরত্বে থাকলেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা চলে।

- **প্রতিবন্ধক ফসল জন্মিয়ে**

কোন ফসলের বিভিন্ন জাতের বীজ একই মাঠে উৎপাদন করার প্রয়োজন হলে জাতগুলোর মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধক ফসল ব্যবহার করে এক জাত থেকে অন্য জাতের কীট পতঙ্গের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। ভুট্টা, সূর্যমূখী এবং এ জাতীয় লম্বা ঘন পাতা বিশিষ্ট গাছপালাকে প্রতিবন্ধক ফসল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

- **গার্ড বা প্রহরী সারি জন্মিয়ে**

বীজ ফসলের চারপাশে প্রহরী বা গার্ড সারি লাগিয়ে বীজ ফসলকে বাইরের পরাগরেণুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। গার্ড সারি হলো বীজ ফসলের চারপাশে বেশ কয়েক সারি ঐ জাতেরই গাছ জন্মানো যাদের বীজ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত বীজের সাথে মেশানো হয় না। কীট পতঙ্গ বাইরে থেকে উড়ে এসে প্রথমে বাইরের দিকের গাছগুলোর উপর বসে বলে বাইরে থেকে নিয়ে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত পরাগরেণু গার্ড সারির গাছগুলোকে মিশ্রিত করতে পারে, মূল বীজ ফসলকে নয়।

অধিকাংশ সবজির ক্ষেত্রে ফুল ফোটার একটু পূর্বে বা ফুল ফোটার সাথে সাথে পরাগরেণু মুক্ত হতে থাকে এবং দিনের কয়েক ঘন্টা মাত্র তা চলতে থাকে। সাধারণত ফুল সকালে প্রস্ফুটিত হয় এবং ২-১৬ ঘন্টা খোলা অবস্থায় থাকে। অধিকাংশ ফুল রাতে বন্ধ হয়ে যায় এবং পর দিন আবার প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু তা স্বল্পতম সময়ের জন্য। অন্য দিকে গর্ভমুন্ডের পরাগরেণু গ্রহণ ক্ষমতা কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত বিরাজকাল থাকতে পারে। পরাগ সঞ্চারণ আর গর্ভমুণ্ডের পরাগ গ্রহণ ক্ষমতা একই সময়কালের মধ্যে থাকলে তবে পরাগায়ন কৃতকার্য হতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন সবজি ফসলে পরাগায়ন নিশ্চিত করার জন্য কীটপতঙ্গের উপস্থিতির সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলে কোন ফসলে কতটি কীটপতঙ্গ থাকলে পরাগায়ন নিশ্চিত হয় সেটি জানলে পরাগায়ন বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

বাঙ্গি ফসলে দশটি ফুলের জন্য একটি মৌমাছি যথেষ্ট। শসা, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া আর লাউয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ ফুলের জন্য একটি মৌমাছির উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর বীজ ফসলের জন্য ২টি বা ৩টি মৌমাছির বাসা মাঠে উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে দিলেই পরাগায়ন নিশ্চিত হয়। মূলার ক্ষেত্রে যেহেতু ফুল একেবারই অনার্কষণীয়, সেজন্য মাঠে অধিক সংখ্যক কীটপতঙ্গের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি হেক্টর মূলার জমিতে ৩-৪টি মৌমাছির বাসা মাঠে বসিয়ে দিলে বীজের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। পেঁয়াজ ফসলের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক মৌমাছির উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। এক থেকে দশ হেক্টর পেঁয়াজের বীজ ফসলের মাঠে একটি মৌমাছির বাসা বসিয়ে দিলেই চলে। গাজরে একই সাথে বায়ু পরাগায়ন ও কীটপতঙ্গ পরাগায়ন সম্পন্ন হয়। তবে মৌমাছি গাজরের পরাগায়নে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে। প্রতি হেক্টর গাজরের জমিতে একাধিক মৌমাছির বাসা স্থাপন করলে ভাল হয়।

হাইব্রিড সবজির বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরাগায়নের বিষয়টির সাথে বীজের মূল্যটি সরাসরি জড়িত। শতভাগ পর-পরাগায়ন নিশ্চিত করতে পারলে সর্বাধিক পরিমাণ বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদনের সময় বায়ু পরাগায়ন বা কীটপতঙ্গ পরাগায়নের পাশাপাশি হাত দিয়ে পরাগায়ন নিশ্চিত করা অনেক ফসলেই বেশ লাভজনক। যেসব ফসলে একবার পরাগায়ন অথবা একটি ফুলের পরাগায়ণ অনেক সংখ্যক বীজ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় সেসব ক্ষেত্রে হস্ত পরাগায়ন কষ্টকর কোন বিষয় নয়। লাউ, কুমড়া, শসা, বাঙ্গি, তরমুজ, চিচিঙ্গা ইত্যাদি সবজির ক্ষেত্রে একটি ফুলের পর-পরাগায়ন সৃষ্টি করে শত শত বীজ। ফলে হস্ত পরাগায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট হাইব্রিড বীজ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এমনকি স্ব-পরাগী সবজি যেমন-টমেটো, বেগুন এবং মরিচের ক্ষেত্রেও হস্ত-পরাগায়নের মাধ্যমে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন সম্ভব এবং তা বেশ লাভজনক।

বীজ ফসলের জন্য সতর্কতা অবলম্বন না করলে অনুন্নত জাতের পরাগরেণু সমস্ত বীজ উৎপাদন প্রচেষ্টাকে ভন্ডুল করে দিতে পারে। সবজির বীজ উৎপাদনের সময় পরাগায়ন সহায়ক পরিবেশের পাশাপাশি পর-পরাগায়নের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেওয়া বেশ জরুরী। আজকাল যেহেতু প্রাকৃতিক পর-পরাগায়নের সুযোগ বেশ সীমিত হয়ে আসছে তাই কৃত্রিম ভাবে মৌমাছির বাক্স বীজ মাঠে যথাসময়ে স্থাপন করে বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বীজের মান রক্ষা এবং অধিক পরিমাণ বীজ উৎপাদনের জন্য পরাগায়নের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেওয়া এখন সময়ের দাবী।

২

বীজহীন ফল

ফলের প্রতি আমাদের আছে একটি সহজাত টান। আমাদের আদি পূর্বপুরুষ থেকে শুরু করে এই বুদ্ধিমান মানুষও এখন থেকে আট দশ হাজার বছর পূর্বেও পশু বধ আর মাৎস্য শিকারের পাশাপাশি গাছপালার ফলমূল খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতো। ফলে রয়েছে আমাদের শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর খনিজ লবণ। সুস্থ সবল নিরোগ দেহ রক্ষার জন্য ফল তাই লোভনীয় এক খাদ্য। এ কারণে ফলের প্রতি আমাদের আছে বিশেষ এক অনুরাগ। তদুপরী স্বাদ গন্ধ রস আর বাহারী বর্ণ মিলে ফল সহজেই আমাদের চিত্তকে রসময় করে তোলে।

যে গাছে ফুল হয় সে গাছে ফলও তৈরী হবে-এটিই আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। আর যে গাছে ফল হবে সে ফলের জঠরে বংশ রক্ষার একক হিসাবে লুকিয়ে থাকবে বীজ-এটিই আমরা আশা করি। বীজ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গাছপালা নিশ্চিত করে তার বংশ রক্ষার আর বংশ বিস্তারের কাজটি। তাই ফলের ভেতর বীজ সৃষ্টি গাছপালার একটি অন্তর্গত তাগিদেরই ফলাফল। ফুলের গর্ভাশয়ের ডিম্বকের ভেতরকার ডিম্ব কোষের সঙ্গে পুংগ্যামেটের মিলন কেবল যে বীজ তৈরী করে তাই নয় বরং এ নিষেক ক্রিয়ার ফলে গর্ভাশয়কে যে ফলে পরিণত হতে হবে এ সংকেতও পেয়ে যায় গাছপালা। বীজ সৃষ্টি আর ফল তৈরি হওয়ার মধ্যে আসলে রয়েছে এক নিবিড় যোগাযোগ।

ফল আর বীজের বৃদ্ধির মধ্যে যে ধনাত্মক একটি সম্পর্ক রয়েছে গবেষণার মাধ্যমে তারই একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন বিজ্ঞানী নিস্ (Nitsh)। তাঁর কাজটি ছিল স্ট্রবেরীর ফলকে নিয়ে। স্ট্রবেরীর ফল আভিধানিক অর্থে ফল বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নয়। এখানে গর্ভাশয়টি নয় বরং পুষ্পপত্রাধারটি (receptacle) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ফলে পরিণত হয়। গরাগায়ন না ঘটলে পুষ্পপত্রাধারটি থেকে যায় অবিকশিত। তাতে ফল সৃষ্টিও ব্যাহত হয়। ফুলে স্বাভাবিক পরাগায়ন না ঘটলে অথবা পুষ্টির অভাব দেখা দিলে যদি বীজ তৈরী ব্যাহত হয় তবে স্ট্রবেরীর ফল খুব ছোট হয় (চিত্র)। কখনও আকার যদি ছোট না হয় তো ফল হয়ে পড়ে বিকৃত।

ক খ গ

চিত্র ঃ স্ট্রবেরীর ফলের বিকাশে বীজের প্রভাব

ক) বীজসহ ফল, খ) ফল বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে বীজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, গ) বীজ সরিয়ে নিয়ে কচি বর্ধনশীল ফলে অক্সিন পেস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

বোঝাই যাচ্ছে কোন ফলে বীজ হবে না কিন্তু ফলটি স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করবে তা ঘটে না অনেক ফলের ক্ষেত্রেই। কারণ ফলের বৃদ্ধি আর বিকাশের উপর বীজের রয়েছে পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। ডিম্বকের ডিম্বকোষ নিষিক্ত হওয়ার পরই দ্রুত সেখানে তৈরি হয় প্রাকৃতিক হরমোন-অক্সিন। কিছু অক্সিন অতঃপর স্থানান্তরিত হয় ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয়ের প্রাচীরে। ডিম্বক আর ডিম্বাশয় দুটোই খাদ্য জমা হওয়ার আধারে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে নিষিক্ত ডিম্বক পরিণত হয় বীজ আর গর্ভাশয়টি ফলে।

এ রকম ধনাত্মক সম্পর্ক যে সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়। নয় বলেই প্রকৃতিতে কোন কোন গাছে অবিরত আবার কোন কোন গাছে অনিয়মিত বীজহীন ফল তৈরি হতে দেখা যায়। ফলে বীজ সৃষ্টির জন্য দুটো ঘটনা খুবই জরুরী। এর একটি হলো ফুলের পরাগায়ন আর অন্যটি হলো স্ত্রী গ্যামেটের নিষেক। এর যে কোন একটি ব্যাহত হলেই ব্যাহত হয় বীজ সৃষ্টি। পরাগায়ন সম্পন্ন হয় না বলেই কিছু কিছু গাছে বীজহীন ফল দেখা যায়। টমেটো, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, কলা আর শসায় এ রকম বীজহীনতা দেখা যায়। কোন কোন গাছে অবশ্য নিষেক অত্যাবশ্যক না হলেও বীজহীন ফলের জন্য পরাগায়ন একান্ত জরুরী। ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণু উড়ে এসে আশ্রয় পেলেই গর্ভাশয়ে তৈরি হয় প্রয়োজনীয় হরমোন। গর্ভাশয় অতঃপর পরিণত হয় বীজহীন ফলে। এ রকম নিষেকবিহীন বীজহীন ফলকে বলা হয় 'পার্থেনোকার্পিক' ফল। পার্থেনোকার্পিক ফল দেখা যায় কলা, আনারস, লেবু আর আঙ্গুরে। পরাগায়ন এবং নিষেক সম্পন্ন হয়েছে এমন ফুলও সৃষ্টি করতে পারে

বীজহীন ফল। ভ্রূণপাতের ফলে বীজ সৃষ্টি ব্যাহত হয় বলেই পাওয়া যায় এসব বীজহীন ফল। এভাবে বীজহীন ফল তৈরি হয় পীচ, চেরী আর আঙ্গুরে।

খুব কম প্রজাতির গাছই আছে যারা নিয়মিতই সৃষ্টি করে বীজহীন ফল। বীজই যাদের বংশ রক্ষার একমাত্র উপায় সেসব গাছে নিয়মিত প্রাকৃতিক বীজহীনতা প্রত্যক্ষ করা এক অসম্ভব ব্যাপার। বিকল্প বংশ রক্ষার সুযোগ আছে বলেই বীজহীন ফল নিয়মিত সৃষ্টি করেও প্রকৃতিতে টিকে আছে কলা। এদের বীজহীনতা নেহায়েতই কোন উপায় নেই বলে। কলা হলো একটি 'ত্রিপ্রস্তি' (triploid) প্রজাতি। ত্রিপ্রস্তি হবার কারণে এর মিয়োসিস বেশ অনিয়মিত। সিংহভাগ স্ত্রী আর পুংগ্যামেটই এর অনুর্বর। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরাগায়ন এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিষেক হয় ব্যাহত। আর তাই অনিবার্যভাবেই তৈরি হয় বীজহীন ফল। তবে নিষেক সম্পন্ন হলে অল্প ক'টি বীজও যে কলায় হতে পারে সে রকম কলাও আমরা দেখতে পাই।

কলায় বীজহীনতা যে কতটা কাঙ্ক্ষিত আমরা তা টের পাই যখন আমরা এটে বা আইট্টা কলা ভক্ষণ করি তখন। প্রকৃতিতে নিয়মিত বীজহীন না হলেও কত গাছেরই না বীজহীন ফল আমাদের পরম কাঙ্ক্ষিত। তরমুজ, পেয়ারা, আঙ্গুর, লেবু, কমলা, পীচ, চেরী এমনকি মরিচের ফলও যদি বীজহীন হয় তবে তা কতই না আনন্দের খবর হয়ে ওঠে। উদ্ভিদ প্রজননবিদরা কিন্তু ভোক্তাদের চাহিদার সে খবর রাখেন। রাখেন বলেই নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এসব গাছের বীজহীন ফল তৈরির কৌশল তারা উদ্ভাবন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে তারা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আজ পৃথিবীর নানা দেশেই খাবার টেবিলে পরিবেশিত হচ্ছে এসব বীজহীন ফল মহাসমাদরে।

জাপানে বীজহীন তরমুজের আবাদ হচ্ছে বেশ অনেক বছর ধরেই। জাপান ছাড়াও আরও কিছু দেশে বীজহীন তরমুজ এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এমনিতে স্বাভাবিক তরমুজের জাতগুলো হলো দ্বিপ্রস্তি (diploid)। এদের প্রচুর বীজ তৈরি হয়। বীজহীন তরমুজের জাত ত্রিপ্রস্তি (triploid) প্রকৃতির। প্রতিটি ক্রোমোজম তিনটি করে থাকায় এসব জাতের ফুলে কলার ফুলের মতোই কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজম জোড়ায়নের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রিযোজী (trivalent) তৈরি হয় বিধায় গ্যামেট অনুর্বর বা মৃত প্রকৃতির হয়। বীজহীন তরমুজ সৃষ্টির কৌশলটি যে বেশ জটিল তা কিন্তু নয়। দ্বিপ্রস্তি ক্ষুদে চারাগাছে কলচিসিন নামক রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ (০.২-০.৪%) প্রয়োগ করে প্রথমে চতুর্প্রস্থি (tetraploid) গাছ সৃষ্টি করা হয়। দ্বিপ্রস্তি চারার বর্ধনশীল অংশে তুলার একটি ছোট প্যাড স্থাপন করে ৪-৬ দিন সকাল সন্ধ্যায় এক ফোটা করে কলচিসিন দ্রবণ প্রয়োগ করে চতুর্প্রস্তি গাছ

পাওয়া সম্ভব। চতুর্প্রস্তি গাছকে স্ত্রী-প্রজনক হিসাবে ব্যবহার করে দ্বিপ্রস্তি গাছের পরাগ সংযোগ করে ত্রিপ্রস্তি (triploid) বীজ পাওয়া যায়। এসব ত্রিপ্রস্তি বীজ বপন করেই পাওয়া যায় বীজহীন তরমুজের ফল।

আসলে তরমুজের বীজহীন ফল একেবারেই যে বীজহীন তা কিন্তু নয়। বীজ আছে তবে তা খুব ছোট ছোট। অবশ্য স্বাভাবিক আকৃতির বীজও কিছু পাওয়া যায় যাদের অধিকাংশই ফাঁপা। ত্রিপ্রস্তি গাছে ফল ধারণের সংখ্যা বাড়াবার জন্য পরাগায়নের প্রয়োজন হয়। জমিতে প্রতি তিন সারি পর পর এক সারি দ্বিপ্রস্তি গাছ লাগালে ফলন ভাল হয়। এক্ষেত্রে দ্বিপ্রস্তি গাছের পরাগরেণু ত্রিপ্রস্তি গাছের গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়াই বড় কথা। নিষেকের কোন প্রয়োজন হয় না।

অনেক ফলের ক্ষেত্রেই এখন বীজহীনতা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে নানা দেশে। বিশেষ করে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে বীজহীন ফল তৈরি করতে গবেষকগণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। অক্সিন প্রয়োগ কোন কোন ফলের ক্ষেত্রে বীজহীনতা সৃষ্টি করে। স্ট্রবেরীর বীজ ন্যাপথালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা পিকলোরাম প্রয়োগ করলে বীজহীন ফল পাওয়া যায়। আম, কুল, তাল, এভোক্যাডো ইত্যাদি ফলের ক্ষেত্রে ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড বীজহীনতা সৃষ্টি করতে অক্ষম কিন্তু জিবেরেলিন প্রয়োগ করে এসব ক্ষেত্রে বীজহীন ফল পাওয়া যায়। সাইটোকাইনিন্‌স প্রয়োগও পার্থেনোকার্পিক ফল তৈরি করে কোন কোন ফলে। ডুমুর আর আঙ্গুর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে বীজহীনতা সৃষ্টির সময় দু'টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। এক, সঠিক সময়ে এবং সঠিক মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ; দুই, ব্যবহৃত মাত্রা বীজহীন ফল ভক্ষণকারী মানুষের জন্য কোন রকম স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি না করে।

আমাদের দেশেও বীজহীন ফল তৈরির চেষ্টা যে চলছেনা তা কিন্তু নয়। এক্ষেত্রে আমরা এখনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পেলেও সাফল্য যে খুব বেশি দূরে এ কথা বলা টিক হবে না। আমাদের সবজি বিজ্ঞানীগণ ত্রিপ্রস্তি বীজহীন তরমুজ সৃষ্টি করতে পারেন সহজেই। বীজহীন তরমুজের দাম পড়বে অনেক বেশি ঠিক তবে তার জন্য যে গ্রাহকের অভাব হবে আমাদের ফলের দোকানগুলোর রমরমা ব্যবসা দেখে তা মনে হয় না। এদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন আমাদের বিজ্ঞানীগণও নির্দিষ্ট মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করে লেবু পেয়ারার মতো বেশ কিছু ফলেই বীজহীনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। ফলের প্রতি যাদের প্রচণ্ড অনুরাগ আছে তারা নিশ্চয়ই সেদিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

ফসলের কৃত্রিম বীজ

বীজ বলতে সাধারণভাবে ফসলের ভেতরে জন্মানো বীজকেই ধরে নেওয়া হয়। সুনির্দিষ্ট যৌন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ ধরনের বীজ তৈরি হয়। ফুলের জঠরে লুকিয়ে থাকা এক একটি ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। নিষিক্ত ডিম্বক নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বীজ রুপে আত্মপ্রকাশ করে। এ ধরনের বীজকে প্রাকৃতিক বীজ বা যৌন বীজ বলা হয়। এদের অবশ্য বোটানিক্যাল বীজও বলা হয়। এ ধরনের বীজকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে হলে প্রথমেই চোখে যে আবরণীটি ধরা দেয় সেটি হলো বীজ আবরণী। বাইরের সব রকম প্রতিকূলতা থেকে বীজকে সুরক্ষা করা এর একটি প্রধান কাজ। বীজকে ভেঙ্গে ফেললে এর ভেতর দু'টি পৃথক অংশ দেখা যায়। একটি হলো এর প্রাণ। আগামী দিনের উদ্ভিদ হয়ে উঠবার অপেক্ষায় দিন গুনছে যে ক্ষুদ্রাকার অংশটি এর নাম 'ভ্রুণ'। এর প্রতিটি কোষে অবস্থিত জিনের ভেতর পরিপূর্ণ উদ্ভিদ হয়ে উঠবার এবং একটি নির্দিষ্ট অবয়ব পাবার সব তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। এসব জিনের বহিঃপ্রকাশই তৈরি করে এক একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ। ভ্রুণের বাইরে এর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যুক্ত হয়ে আছে যে অংশ এর কাজ হলো বীজের ভ্রুণকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা। ধান, গম ইত্যাকার এক বীজপত্রী ফসলে এ অংশটিকে বলা হয় 'সস্য' বা আন্তঃশাস। আর ছোলা, মটর, ডাল জাতীয় দ্বিবীজপত্রী ফসলে একে বলা হয় 'বীজপত্র'। একটি 'ভ্রুণ' আর একে বেষ্টন করে থাকা 'সস্য' বা 'বীজপত্র' একটি আবরণী দিয়ে যখন ঢাকা থাকে তখন আমরা একে বীজ বলি।

এ ধরণের প্রকৃত বা যৌন বীজের বাইরেও ফুলের জঠর থেকে আর এক রকম বীজ তৈরি হয়ে থাকে কোন কোন উদ্ভিদ প্রজাতিতে। এ ধরনের বীজ তৈরি হবার জন্য কোন প্রকার নিষেকের প্রয়োজন হয় না। ডিম্বকোষ বা ডিম্বকযন্ত্রের অন্য যে কোন কোষ কিংবা ভ্রুণ থলিতে অবস্থিত যে কোন ভ্রুণ পোষক কলা সরাসরি বীজে রূপান্তরিত হতে পারে। এ ধরনের বীজকে বলে অযৌন বীজ বা অপ্রকৃত বীজ বা নিষেকবিহীন বীজ।

এতো গেলো যৌন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া বীজের কথা। যৌন প্রক্রিয়া ছাড়াই উদ্ভিদের নানা অংশ থেকে টিস্যু নিয়ে আজকাল তৈরি করা হচ্ছে অঙ্গজ ভ্রুণ। উদ্ভিদের অঙ্গজ অংশ থেকে টিস্যু নিয়ে কালচার মিডিয়াতে টিস্যু

কালচার করে এসব 'অঙ্গজ ভ্রুণ' তৈরি করা হয়। কেবল অঙ্গজ ভ্রুণ হলেইতো আর বীজ তৈরি হবে না, এর জন্য প্রয়োজন ভ্রুণকে নিশ্চিতভাবে খাদ্য সরবরাহ করতে পারে সেরকম কৃত্রিম সস্য। বিজ্ঞানীরা ভ্রুণকে খাদ্য সরবরাহ করতে পারে তেমন উপাদানও তৈরি করছেন নানা রকম উপকরণ একত্রে মিশিয়ে। একরকম জেলের মধ্যে কৃত্রিম ভ্রুণকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে একদিকে যেমন খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় তেমনি তা বীজাবরণীর মতো বীজকে সুরক্ষা করে থাকে।

যৌন প্রক্রিয়া 'ভ্রুণ' তৈরির যাত্রা শুরু হয় ডিম্বকোষের সাথে শুক্রানুর মিলনের মধ্য দিয়ে। এরকম মিলন তৈরি করে যে কোষ একে 'জাইগোট' বলা হয়। এ জাইগোটটি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নানা রকম রূপান্তর শেষে তৈরি করে ভ্রুণ। জাইগোট বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো কোষ একত্রিত করে একটি গোলাকার পিন্ড তৈরি করে। এরপরও চলে কোষ বিভাজন এবং একসময় এটি মানুষের হৃদপিণ্ডের আকৃতি ধারণ করে। এ অবস্থাটাও স্থায়ী রুপ নয়। এর আরও রূপান্তর ঘটে। এর পরবর্তী রূপান্তরের ধাপটি হলো 'ব্যাঙাচি'-র আকৃতি ধারন। এটি আরও একবার রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে বীজ পত্রাকৃতি ধরনের ভ্রুণ। এ অবস্থায় ভ্রুণটি সস্যের সাথে যুক্ত হয়ে বীজের ভেতরে অংকুরিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

যৌন প্রক্রিয়ায় এই যে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বীজের ভ্রুণ আত্মপ্রকাশ করে তেমনি এক রূপান্তরের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় অঙ্গজ ভ্রুণও। অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকলেও যৌন উপায়ে তৈরি হওয়া ভ্রুণ আর টিস্যু কালচার করে অঙ্গজ রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট ভ্রুণের মধ্যে খুব বেশি রকমফের নেই। টিস্যু কালচার এখন জীব প্রযুক্তির একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শাখায় পরিণত হয়েছে। অল্প স্থানে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক ফসলের বংশ বিস্তারক্ষম উৎপাদন একক সৃষ্টিতে টিস্যু কালচারের বিভিন্ন কৌশল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পৃথিবীর নানা গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফসল যৌন প্রক্রিয়ায় যে প্রকৃত বীজ উৎপাদন করছে তার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে চাচ্ছে না আর বিজ্ঞানীরা। অনেক ফসলের একটি ফলে তৈরি হয় অল্প কয়েকটি মাত্র বীজ। এসব গাছের ফুলকে যান্ত্রিক উপায়ে পুংহীনকরণের মাধ্যমে পরপরাগায়ন সম্পন্ন করে প্রতি ফলে অল্প কয়েকটি করে বীজ উৎপাদন করা হলে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে খরচ পড়বে অনেক বেশি। এসব ফসলে হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতায় সুফল ভোগ করার সুযোগ খুবই সীমিত। অন্যদিকে আবার অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করে যেসব ফসল এরা কোন বীজ সৃষ্টি করে না। কিংবা এদের বীজ সৃষ্টি হলেও ফসলের গুণমান রক্ষার স্বার্থে বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয় না। এরকম ক্ষেত্রে অঙ্গজ ভ্রুণ উৎপাদন করে বীজ সৃষ্টি করতে পারলে তা

তেমনি কৃত্রিম বীজাবরণীরও ব্যবস্থা করতে হয়। অঙ্গজ ভ্রুণের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য একে এক প্রকার কৃত্রিম সস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর কৃত্রিম সস্য সমৃদ্ধ অঙ্গজ ভ্রুণকে প্রতিরক্ষা জেলীর ক্যাপসুলে ঢুকিয়ে তৈরি করা হয় এক একটি কৃত্রিম বীজ।

উদ্ভিদের দেহ কোষ আবাদ করে এসব বীজ তৈরি করা হয় বলে এদের বলা হয় অঙ্গজ বীজও। কৃত্রিম বীজ উৎপাদন একটি বহুধাপ বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। এর গোড়ার কাজটি হলো নির্বাচিত ফসল প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে কোষ বা কলা আলাদা করে তা কৃত্রিম ভাবে মিডিয়াতে আবাদ করে এক সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক অঙ্গজ ভ্রুণ উৎপাদন নিশ্চিত করা। যে সব উদ্ভিদ প্রজাতির কোষ কলা আবাদ করে সহজে অঙ্গজ ভ্রুণ তৈরি করা সম্ভব সে সব প্রজাতির মধ্যে এ কৌশল প্রয়োগ কেবল লাভ জনক হতে পারে।

এ যাবত সাড়ে তিনশরও অধিক উদ্ভিদ প্রজাতিতে অঙ্গজ ভ্রুণ বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। আর অঙ্গজ ভ্রুণ বিকাশ লাভ করে মূল ও বীটপ সমৃদ্ধ অঙ্গজ ভ্রুণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে প্রায় দেড়শ প্রজাতিতে। অঙ্গজ ভ্রুণ উৎপাদন কৃত্রিম বীজ উৎপাদনের প্রথম ধাপ। দু'ভাবে অঙ্গজ ভ্রুণ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ক্যালাস তৈরি করে ক্যালাস থেকে অঙ্গজ ভ্রুণ সৃষ্টি একটি উপায়। অন্য উপায়টি হলো সরাসরি কোষ থেকে ভ্রুণ উৎপাদন। ক্যালাস সৃষ্টির মাধ্যমে ভ্রুণ তৈরি করতে হলে আলাদা কোষের আবাদ করা অত্যন্ত জরুরী। একে সাসপেনশন কালচার বলা হয়। আবাদ মাধ্যমে সাধারণত অধিক মাত্রায় অক্সিন প্রয়োগ করতে হয় অঙ্গজ ভ্রুণ সৃষ্টির লক্ষ্যে। ক্যালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পরে মাধ্যমে হরমোনের হারের তারতম্য ঘটিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি করা হয় ভ্রুণ। এভাবে প্রাপ্ত ভ্রুণগুলো বিকাশের নানা স্তরে অবস্থান করতে পারে বীজ তৈরির সময়। নানা আকৃতির চালনির মধ্যে দিয়ে এসব নানা স্তরের ভ্রুণ থেকে নির্দিষ্ট আকৃতির পরিপক্ক ভ্রুণ আলাদা করে নেয়া সম্ভব।

তরল এবং নিরেট দু'রকম কালচার মিডিয়ারই প্রয়োজন হয় ভ্রুণ সৃষ্টির জন্য। কালচার মিডিয়াতে কখনও অক্সিন বা কখনও সাইটোকাইনিন বা কখনও অক্সিন এবং সাইটোকাইনিন যুক্ত করে কোষ বিভাজন ত্বরান্বিত করা হয়। এসময় অল্প মাত্রায় সুক্রোজ ব্যবহার করতে হয়। আর টিস্যুগুলোকে রাখতে হয় অন্ধকারে। এভাবেই শুরু হয় কোষ বিভাজন। বিভাজিত কোষকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয় অক্সিন, সাইটোকাইনিন, অল্প মাত্রায় সুক্রোজ আর অন্ধকার পরিবেশ। অঙ্গজ ভ্রুণের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দু'টো হরমোনই লাগে, শুধু বাড়িয়ে দিতে হয় সুক্রোজের পরিমাণটা। পর্যাপ্ত সংখ্যক অঙ্গজ ভ্রুণ এভাবে তৈরি করা শেষ হলে এবার ভ্রুণকে পরিপক্ক করে

তুলতে হয়। এর জন্য বাড়তি লাগে এ্যাবসিসিক এসিড। ভ্রুণ পরিপক্ক হয়ে গেলে MS মিডিয়ার খনিজ দ্রবণ অর্ধেক মাত্রায় লঘু করে ভ্রুণকে এতে রাখা হয়। সুক্রোজের মাত্রাটাও কমিয়ে আনা হয় লিটার প্রতি ৫ গ্রামে।

শুষ্ক ও আর্দ্রতাপূর্ণ দু'রকমের কৃত্রিম বীজ তৈরি করা হয়। শুষ্ক কৃত্রিম বীজের ক্ষেত্রে এক দু'সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে এদের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমিয়ে আনতে হয়। আবার পেট্রিডিস খুলে দিয়ে সারা রাত এদের শুষ্ক করার ব্যবস্থাও নেয়া যেতে পারে। পলিঅক্সিনথাইলন আবরণীর মধ্যে অঙ্গজ ভ্রুণকে আবদ্ধ করে দিয়ে শুষ্ককরণ সম্পন্ন করা হয়। যেসব প্রজাতির অঙ্গজ ভ্রুণের আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস করলে তা সইতে পারে সেসব প্রজাতির ক্ষেত্রে শুষ্ককরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শুষ্ক অঙ্গজ ভ্রুণ সাধারণ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় বেশ কয়েক মাস।

আর্দ্রতাপূর্ণ কৃত্রিম বীজ তৈরি করতে হয় সেসব প্রজাতির ক্ষেত্রে যেখানে একটি নির্দিষ্ট আর্দ্রতার নীচে চলে গেলে মরে যায় অঙ্গজ ভ্রুণ। অঙ্গজ ভ্রুণ হাইড্রোজেল ক্যাপসুলে আবদ্ধ করে তৈরি করা হয় আর্দ্রতাপূর্ণ বীজ। এক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হলো সোডিয়াম এলজিনেটের সঙ্গে ক্যালসিয়াম আয়নের সংযোগ ঘটিয়ে তৈরি করা জেলে অঙ্গজ ভ্রুণকে আবদ্ধ করা। সমবয়সী ও সমাকৃতি বিশিষ্ট ভ্রুণ পৃথক করার পর দ্রুত এদের ক্যাপসুলাবদ্ধ (encapsulation) করা হয়। একাজে ব্যবহার করা হয় পানিতে দ্রবীভূত হতে সক্ষম নানা রকমের হাইড্রোজেলের। প্রতিটি জেলের ঘন দ্রবণ তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় কমপ্লেক্সিং এজেন্ট। একাজে ব্যবহৃত হয়েছে শতকরা ২ ভাগ সোডিয়াম এলজিনেট। প্রথমে অঙ্গজ ভ্রুণকে এ দ্রবণের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। অতঃপর ভ্রুণগুলোকে ক্যালসিয়াম লবণ যথাঃ ক্যালসিয়াম নাইট্রেট বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে ৩০ মিনিটের জন্য রেখে দেয়া হয়। সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম আয়ন বিনিময় দ্রুতই ভ্রুণসহ একটি নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে। ফলশ্রুতিতে তৈরি হয়ে যায় এক একটি কৃত্রিম বীজ।

আগেই বলেছি কৃত্রিম বীজের কোন সস্য থাকেনা। ফলে কোন না কোন ভাবে ভ্রুণকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে ০.৫ মিমি ব্যাস বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার সুক্রোজ দানা আবরণী জেলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হচ্ছে। এসব সুক্রোজ দানার বাইরে একটি চমৎকার আবরণী তৈরি করা হয় ট্রাইক্লোরোইথাইল আর মৌমাছির মোমের মিশ্রিত দ্রবণ স্প্রে করে দিয়ে। জেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া এসব সুক্রোজ দানা ২৫°c তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে ৩ দিন থেকে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সুক্রোজকে ভ্রুণের জন্য সহজ লভ্য করে দেয়। আবার এসব

বীজ ৪°c তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে কোন সুক্রোজই সহজলভ্য আকারে বেরিয়ে আসতে পারে না।

কৃত্রিম বীজত্বকের অঙ্গজ ভ্রুণ তথা বীজের জন্য থাকতে হবে অনেকগুলো বিশেষ গুণাবলী। কৃত্রিম বীজের ভেতরে বিদ্যমান অঙ্গজ ভ্রুণের জন্য কোন রকম ক্ষতিকর প্রভাব এর থাকা চলবেনা। বীজ সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বীজ রোপনের সময় একে টেকসই হতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগম এবং রূপান্তরনের সময় বীজ ত্বকটির ভ্রুণকে রক্ষা করতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় এর মধ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান থাকতে হবে। বিদ্যমান খামার যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাটিতে বীজ রোপন যোগ্য হতে হবে।

কৃত্রিম বীজ তৈরি হবার পর এসব বীজ কতটা গজাতে সক্ষম, এদের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হতে কোন সমস্যা আছে কিনা এবং যে গাছ থেকে কোষ কলা নিয়ে এসব বীজ তৈরি করা হলো সে গাছের বৈশিষ্ট্য মাতৃ গাছের মত রইলো কিনা এমনিতর নানা বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। কৃত্রিম বীজকে অনুকূল পরিবেশে জন্মাবার সুযোগ দিয়ে এসব পরীক্ষা করা সম্ভব।

১৯৭৭ সনে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি সিম্পোজিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী টি. মুরাসিগি প্রথম কৃত্রিম বীজের ধারণাটি প্রদান করেন। এরপর থেকে কৃত্রিম বীজ তৈরির গবেষণা চালানো হয়েছে বেশ কিছু ফসলে। এ যাবৎ অঙ্গজ ভ্রুণ সৃষ্টি এবং তা থেকে উদ্ভিদ প্রাপ্তির সাফল্য এসেছে আলফা আলফা, সিলারি (celery), বেগুন, গাজর, ব্রাসিকা, লেটুস, চন্দনকাঠ, ধানে। অঙ্গজ কোষ কলা ছাড়াও উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল (axillary bud) এবং অস্থানিক কুঁড়ি (adventitious bud) ব্যবহার করে ইউকেলিপটাস, আঙ্গুর আর মালবেরীতে কৃত্রিম বীজ উৎপাদন এবং বীজ থেকে উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এমনকি বিটপ শীর্ষ (shoot tip) ব্যবহার করে কৃত্রিম বীজ ও পরবর্তীতে উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে কলা, লেবু এবং আঙ্গুরের ক্ষেত্রে।

কৃত্রিম বীজ প্রযুক্তি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করার সুবিধা অনেক। এসব বীজ থেকে উৎপাদিত উদ্ভিদ সমষ্টি সমরুপ (homogeneous) প্রকৃতির। এমনিতে কোষ কলা আবাদের মাধ্যমে ক্ষুদে উদ্ভিদ তৈরির জন্য যে দীর্ঘ আবাদ ও উপ-আবাদের প্রয়োজন হয় সরাসরি অঙ্গজ ভ্রুণের ব্যবহার সে তুলনায় অনেক সহজ। নির্বাচিত উৎকৃষ্টতর জেনোটাইপ, হস্তপরাগী হাইব্রিড, জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড উদ্ভিদসমূহ, বন্ধ্যা এবং অস্থিতিশীল জেনোটাইপসমূহ সরাসরি গ্রীনহাউজ বা মাঠে কৃত্রিম বীজ তৈরির মাধ্যমে ব্যবহার কর সম্ভব।

ক্যাপসুলাবদ্ধ ভ্রুণের সঙ্গে সহজে মিশিয়ে দেয়া সম্ভব জীবাণুনাশক, নানা রকম সার, নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি ইত্যাদি। অল্প সংখ্যক কোষ কলা আবাদ করে অল্প স্থানে পাওয়া সম্ভব একই গুণাগুণ সম্পন্ন প্রচুর সংখ্যক ভ্রুণ। অল্প খরচে দামী জাতের ফসলের প্রচুর পরিমাণ বীজ উৎপাদন সম্ভব। বছরের যে কোন সময় এবং যে কোন ঋতুতে এ বীজ ব্যবহার করা সম্ভব। অল্প সময়ে এবং যে কোন সময়ে এ ধরনের বীজ তৈরি করা সম্ভব। প্রকৃত বীজের সুপ্তিকাল বহুলাংশে কাটিয়ে উঠা সম্ভব এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। ফসলের কৌলিসম্পদ বিভিন্ন মেয়াদে সংরক্ষণে এজাতীয় বীজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এমনকি সম্ভব রোগমুক্ত ফসল পাওয়াও।

কৃষিতে এ প্রযুক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও এ মূহুর্তে কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠতে পারেনি। বহু ফসলের ভ্রুণ সৃষ্টির কোষ কলা আবাদ কৌশলটি এখনও যথেষ্ট নির্ভর যোগ্য হয়ে উঠেনি। একই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সমাকৃতির অঙ্গজ ভ্রুণ পাওয়া বেশ কঠিন। অনেকসময় একটি একক ভ্রুণের বদলে একসঙ্গে একাধিক অঙ্গজ ভ্রুণ উৎপাদন এক্ষেত্রে একটি অন্যতম সমস্যা। অঙ্গজ ভ্রুণের কোন বিশ্রাম দশা বা সুপ্তিকাল নেই। এরা সরাসরি চারাগাছে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয়। অথচ বীজ সংরক্ষণ করতে হলে এ অবস্থাটি কিছুতেই প্রত্যাশিত নয়। অঙ্গজ ভ্রুণে সুপ্তিকাল সম্পন্ন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তদুপরি রয়েছে নির্ভরতার সঙ্গে একে ক্যাপসুলাবদ্ধ করা। সবশেষে কৃত্রিম বীজ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টির সাফল্য এখনও বহু ফসলের ক্ষেত্রে বেশ কম। আলফা আলফা ফসলে গ্রীণহাউজ পরিবেশে উদ্ভিদ পাবার সাফল্য শতকরা ৫০ ভাগ। সাইট্রাস ফসলেও কৃত্রিম বীজ থেকে উদ্ভিদ প্রাপ্তির হার বেশ কম। কৃত্রিম বীজ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি সহ সমগ্র প্রক্রিয়াটি সহজ করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত কৃত্রিম বীজ উৎপাদন করতে কিন্তু বেশ খরচ পড়ে যায়। এসব বীজকে কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে কম খরচে কৃত্রিম বীজ উৎপাদন করার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে যেভাবে কৃত্রিম বীজ গবেষণা চলছে তাতে প্রত্যাশিত সাফল্য যে আসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদিন খুব বেশি দেরী নয় যে, ফসলের মাঠে আমরা বুনে দেব কৃত্রিম বীজ। সে বীজ ভেঙ্গে বাইরে চলে আসবে অঙ্কুর। এক সময় তা পরিপক্ক হয়ে কর্তিত হয়ে আসবে আমাদের ঘরে।

ফসলের নিষেকবিহীন বীজ

বীজের কথা মনে আসতেই চট্ করে আমাদের চোখের সামনে ফলের চিত্র ভেসে উঠে। ফলের ভেতরে পরম যত্নে লুকিয়ে থাকে বীজ। উদ্ভিদের ফুলের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে ফল। ফলের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে বীজের দেহ। আরো স্পষ্ট করে বললে গাছপালার ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় বেড়ে ফলে পরিণত হয়। ডিম্বাশয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক একটি ডিম্বক পুংগ্যামেটের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অলক্ষ্যে তৈরি করে এক একটি বীজ। যৌন মিলনের মাধ্যমে এসব বীজ উৎপন্ন হয় বলে এদের যৌন বীজও বলা হয়। যৌন বীজের আরেক নাম হলো প্রকৃত বীজ কিংবা উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ। পুংগ্যামেটের সাথে ডিম্বকের মিলনের নাম হলো নিষেক ক্রিয়া। উদ্ভিদের এতক্ষণ যে বীজের কথা বলা হলো সেগুলো আসলে নিষেকের ফলাফল। ফসলের ফুলের মধ্যে ঘটে যাওয়া যৌন মিলনের মাধ্যমে এসব বীজের সৃষ্টি হয় বলে বীজ থেকে যে উদ্ভিদ জন্ম নেয় এতে পিতামাতা দু'জনেরই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

প্রকৃতিতে জীবকুলে সততই কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনাও ঘটে। তেমনি এক ব্যতিক্রমী ঘটনা হলো উদ্ভিদের নিষেকবিহীন বীজ সৃষ্টি। ডিম্বাশয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ডিম্বক কোনো রকম নিষেক ক্রিয়া ছাড়াই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজে পরিণত হয়ে যায়। কেবল যে ডিম্বক তা কিন্তু নয়, ডিম্বাশয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্যান্য কোষও বেড়ে এক সময় পরিণত হতে পারে বীজে। মাতৃগর্ভে নিষেক ছাড়া তৈরি হওয়া এসব বীজকে বলা হয় নিষেকবিহীন বীজ। কোনোরকম যৌন মিলন ছাড়াই এসব বীজ উৎপন্ন হতে পারে বলে এদের বলা হয় অযৌন বীজ। এদেরই আরেক নাম এপোমিক্টিক বীজ। গত শতাব্দীর আশির দশকের এক হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, উদ্ভিদ জগতের ৩৫টি গোত্রের ৩০০ এরও অধিক প্রজাতিতে অযৌন উপায়ে এ রকম নিষেকবিহীন বীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক এক হিসেব অনুযায়ী, সপুষ্পক উদ্ভিদের ৪০০ উদ্ভিদ পরিবারের শতকরা ১০ ভাগের কাছাকাছি পরিবারে নিষেকবিহীন বীজ তৈরি হয় আর এসব পরিবারের ৪০,০০০ প্রজাতির শতকরা ১ ভাগ প্রজাতিতে এই কৌশল পরিদৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদে তিন উপায়ে তৈরি হতে পারে অযৌন বীজ। উদ্ভিদের ভ্রুণ পোষক কলা বা নিউসেলাস থেকে এক বা একাধিক অঙ্গজ কোষ দুইবার মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তৈরি করে অহ্রাসকৃত ক্রোমোজোম সম্পন্ন ভ্রুণ থলি। এ রকম ভ্রুণথলির ডিম্বাণু থেকে সরাসরি ভ্রুণ তৈরি হওয়ার মাধ্যমে অযৌন বীজ উৎপন্ন হতে পারে। স্বাভাবিক স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ থেকে কার্যকর স্ত্রীরেণু বা ভ্রুণ থলি উৎপন্ন হতে না পারলে এ ধরনের বীজ বেশি তৈরি হয়। আবার স্বাভাবিক স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ থেকে তৈরি হতে পারে অস্বাভাবিক ধরনের ভ্রুণ থলিও। অস্বাভাবিক এই অর্থে যে, ভ্রুণ থলির ডিম্বাণুগুলোর ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক না হয়ে বরং তা থেকে যায় দ্বিগুণিত অর্থাৎ ডিপ্লয়েড অবস্থায় স্ত্রীরেণু মাতৃকোষে মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় জোড়া বাধা ক্রোমোজম পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেলেও সাইটোপ্লাজম অবিভক্ত থাকলে গ্যামেটে ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক না হয়ে বরং তা থেকে যায় দ্বিগুণিত অর্থাৎ ডিপ্লয়েড অবস্থায়ই। ফলে নিষেক ছাড়াই এসব ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু সরাসরি তৈরি করতে সক্ষম ভ্রুণ এবং অতঃপর অযৌন বীজ। আর একটি উপায়ে অযৌন বীজ তৈরি হতে পারে উদ্ভিদে। এর জন্য কোনো ভ্রুণথলি তৈরি হওয়ারই প্রয়োজন হয় না। বরং ডিম্বাশয়ের কোনো অঙ্গজ ডিপ্লয়েড কোষ থেকে সরাসরি তৈরি হয় ভ্রুণাণু। ভ্রুণাণু থেকে ভ্রুণ এবং সবশেষে নিষেক ছাড়াই তৈরি হয় অযৌন বীজ।

উদ্ভিদে যে নিষেকবিহীন বীজ উৎপাদন হতে পারে এ ঘটনা কিন্তু বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে বেশ আগেভাগেই। একই ফসলের ভিন্ন দুটি জাতের উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ন ঘটিয়ে পাওয়া সংকর বীজ মাটিতে পুঁতে দিয়ে যখন সংকর উদ্ভিদে পিতামাতা উভয়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে কেবল সন্তানে মাতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতেন তখন বেশ হতাশ হয়ে যেতেন বিজ্ঞানীরা। লেখক নিজে সরিষা নিয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখতে পেয়েছেন যে, সরিষার ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির সংকরায়ন ঘটালে যে বীজ পাওয়া যায় তার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ উদ্ভিদই হলো নিষেকবিহীন বীজ। অযৌন উপায়ে বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ধান, সরিষা, নাশপাতি এবং লেবু গোত্রের উদ্ভিদ প্রজাতিতে। প্রধান প্রধান দানা শস্যের মধ্যে ভুট্টা, গম এবং কাউনের আত্মীয়দের মধ্যে এ রকম বীজ তৈরির স্বভাব রয়েছে।

আবাদি ফসলের মধ্যে অযৌন উপায়ে বীজ উৎপাদনে সক্ষম ফসলের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। এসব বীজ থেকে উৎপাদিত গাছ দেখতে হুবহু মাতৃগাছের অনুরূপ বিধায় আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের দীর্ঘ ফসল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের গাছ বাদ দিয়েছেন। এ কারণে আমাদের ফসলের নিষেকবিহীন বীজ উৎপাদন স্বভাবের অনুপস্থিতি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে আমাদের আবাদি ফসল এবং

এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান এখনো করা সম্ভব হয়নি বলে সার্বিকভাবে এ নিয়ে সঠিক করে কিছু বলা মুশকিল। তবে সাইট্রাসের বেশ কিছু জাতে এবং সরগামে এ জাতীয় বীজ উৎপাদন পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণভাবে বহুপ্রস্থি বা পলিপ্লয়েড প্রজাতিতে এদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের বিভিন্ন ফসলের বুনো প্রজাতিতেও অযৌন বীজ উৎপাদন কৌশল প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। আর অযৌন বীজ উৎপাদন কৌশলে যে জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এ কথা এখন অজানা নয়। এদের এ নিষেকবিহীন বীজ সৃষ্টির জন্য দায়ী জিন আমাদের ফসলে স্থানান্তর করে নিতে পারলে আমাদের ফসলও অযৌন উপায়ে বীজ উৎপাদনে সক্ষম হবে। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন।

ফসল উন্নয়নের সঙ্গে যারা জড়িত তারা কিন্তু অযৌন বীজ তৈরির কৌশলটাকে তাদের জন্য একটা বাড়তি ঝামেলাই মনে করে আসছিল এতদিন। যেহেতু কেবল মাতৃগাছ থেকেই অযৌন বীজ তৈরি হয় সেহেতু এদের সঙ্গে অন্য গাছের সংকরায়ন করা সম্ভব হতো না অনেক ক্ষেত্রেই। সংকরায়নের ফলে সৃষ্ট বীজ যৌন, না অযৌন প্রকৃতির তা নিয়ে একটি গোলক ধাঁধায় পড়ে যেতে হতো। ফলে গোড়ার দিক থেকে অযৌন উপায়ে বীজ সৃষ্টিকে বেশ অনাকাঙ্ক্ষিতই মনে করা হতো। সাম্প্রতিককালে ধারনাটি কিন্তু পাল্টে গেছে। ঝামেলার চেয়ে বরং এখন বেশ কাঙ্ক্ষিত মনে করা হচ্ছে অযৌন বীজ উৎপাদন কৌশলটিকে।

অনেক ফসলেই এখন হাইব্রিড জাত তৈরি করা হচ্ছে। অনেক সবজি যেমন- লাউ, কুমড়া, শসা, টমেটো, বেগুন ইত্যাদিতে পর-পরাগায়ন থেকে সৃষ্ট এক একটি ফল থেকে পাওয়া যায় অনেকগুলো হাইব্রিড বীজ। কিন্তু দানা শস্য বিশেষ করে ধানের ক্ষেত্রে চিত্রটি কিন্তু ভিন্ন রকম। ধানের একটি ফুলে তৈরি হয় একটি মাত্র ফল বা বীজ। পর-পরাগায়নের মাধ্যমে তাই বাণিজ্যিকভাবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের কোনো সুযোগ নেই। চাহিদা অনুযায়ী হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য তাই হাইব্রিড সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত দুটি পেরেন্টকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় পুংবন্ধ্যাত্ব কৌশলের যথাযথ প্রয়োগ। বিষয়টি যেমন বেশ জটিল তেমনি তার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ দক্ষতারও। এতো গেলো উভয়লিঙ্গ গাছকে স্ত্রী গাছে রূপান্তরের কথা।

ধানে প্রতিনিয়ত হাইব্রিড বীজ তৈরি করার আরো ঝামেলা রয়েছে। ধান প্রাকৃতিক নিয়মেই একটি স্বপরাগী ফসল। একই গাছের একটি ফুলের পরাগরেণু ওই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়ে তৈরি করে এক একটি বীজ। এ রকম স্বপরাগী যার স্বভাব, হাইব্রিড বীজ তৈরি করার সময় সেখানে স্ত্রী গাছকে অপেক্ষা করতে হয় কখন

উড়ে আসবে পুরুষ গাছের পুংরেণু। ধান গাছের পরাগরেণু কোনো কীটপতঙ্গের মাধ্যমে স্ত্রী গাছে পৌঁছে যাবে তেমন সুযোগ নেই। পরাগায়কদের কাছে বড় বেশি অনাকর্ষণীয় এদের ফুল। ফলে পরাগরেণুর জন্য বাতাস আর মানুষের হস্তক্ষেপের উপর স্ত্রী গাছকে নির্ভর করতে হয়। আবার কেবল বাতাসই যথেষ্ট নয়। পুরুষ গাছ আর বীজ ফসলের গাছের উপর দিয়ে রশি টেনে পর-পরাগায়নকে নিশ্চিত করতে হয়। ধানের কচি শিষ যেন ধানের পাতার সুরক্ষিত মোড়ক থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে পরাগায়নকে উৎসাহিত করে সেজন্য বীজ গাছে প্রয়োগ করতে হয় জিবেরেলিন নামক রাসায়নিক পদার্থ। রয়েছে এর সঠিক মাত্রা ও প্রয়োগ করার ঝামেলাও। এর বাইরেও বেশ ঝামেলা রয়েছে ধানের হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। স্ত্রী গাছ আর পুরুষ গাছকে এমন সময়ে লাগাতে হবে যেন এক সাথে এদের ফুল ফোটে। এর জন্য স্ত্রী গাছ আর পুরুষ গাছকে আগপিছ করে পুষ্পায়নের সময়কালকে এক সাথে মিলাতে হয়। এত কিছু করে যে হাইব্রিড বীজ সৃষ্টি করা তার দাম যে অধিক হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। ফলে ধানে হাইব্রিড বীজ ব্যবহারের বড় বাধা এর অধিকমূল্য। অন্যদিকে হাইব্রিড বীজ কিনতে হয় প্রতি বছরই। কারণ যৌন বীজ হাইব্রিডের ফলনশীলতা ধরে রাখে মাত্র প্রথম বংশধরই। দ্বিতীয় বংশধরে এসে জিনের উত্তম সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় বলে কমে যায় ফসলের ফলনশীলতা। তাই নিজের মাঠ থেকে বীজ রেখে ফসল ফলানোর কোনো উপায় নেই কৃষকের। অযৌন বীজ উৎপাদনক্ষম হাইব্রিড ধান তৈরি করা গেলে এসব অসুবিধা থেকে বাঁচা যাবে। অন্তত প্রতি বছর হাইব্রিড ধানের বীজ কেনা থেকে তো অবশ্যই বেঁচে যাবে কৃষক। কেননা অযৌন উপায়ে সৃষ্টি হয় বলে এসব বীজে হাইব্রিডের সম্পূর্ণ গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রেখেই এসব গাছ থেকে পাওয়া বীজ বার বার ব্যবহার করা যাবে। হাইব্রিড ধান গাছ থেকে পাওয়া নিষেকবিহীন বীজ সবসময় থাকবে হাইব্রিড প্রকৃতিরই।

অযৌন বীজ ব্যবহার হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভীষণ সহজ করে তুলতে পারে। এমনিতে কিন্তু হাইব্রিড বীজ তৈরি করতে হলে প্রতি বছর এদের তিন রকমের পেরেন্ট লাইনকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এদের বছর বছর রক্ষা করার কাজটি বেশ জটিল এবং বেশ ব্যয় সাধ্যও। অযৌন বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ব্যবহার করা হলে প্রতি বছর এসব লাইন মাঠে জন্মানো এবং এসব লাইনের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যে দূরত্ব বজার রাখার প্রয়োজন হয় সে ঝামেলা থেকেও মুক্ত থাকা যায়। এমনকি আশপাশের অন্য জাতের সঙ্গে পর-পরাগায়নের মাধ্যমে বীজ মিশ্রিত হওয়ারও কোনো সুযোগ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা যেসব ফসলে পুংবন্ধ্যা বা মাতৃ পেরেন্ট তৈরির জন্য কোনো প্রাকৃতিক কৌশল বিদ্যমান নেই এবং পুং-

উর্বরতা প্রদানকারী (restorer) লইনের উৎস জানা নেই সেখানেও হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা যায়। তাহলে কৃষক নিজেই তার ফসলের মাঠ থেকে রক্ষা করতে পারবে হাইব্রিড বীজ পরবর্তী ফসল ফলানোর জন্য।

আমাদের ফসলে অযৌন উপায়ে নিষেকবিহীন বীজ উৎপাদন কৌশল বিদ্যমান নেই। ফলে তত্ত্বগতভাবে এটি যতই সুবিধাজনক হোক না কেন বাস্তবে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন আরো অনেক গবেষণা। আমাদের যেসব ফসলের বুনো উদ্ভিদে এ বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা স্থানান্তর করতে হবে আমাদের ফসলে। বুনো উদ্ভিদের সঙ্গে প্রায়শই ক্রস করতে পারে না আমাদের ফসল। অনেক সময় সংকরায়ন করা হলে ভ্রুণ তৈরি হয় কিন্তু ভ্রুণ পতনের ফলে বীজ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই কাঙ্ক্ষিত জিন স্থানান্তর সম্ভব হয় না। আজকাল অবশ্য বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে টিস্যু কালচার করে এসব ভ্রুণকে রক্ষা করার কৌশল জানা আছে বিধায় জিন স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

অযৌন বীজ উৎপাদন স্বভাবটি ফসলে স্থানান্তরের সবচেয়ে উত্তম উপায় হতে পারে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ। নির্দিষ্ট জিনটি শনাক্ত করা সম্ভব হলে তা কর্তন করে নিয়ে ফসলের কোষে চালান করে দিয়ে এ স্বভাবটি ফসলে নিয়ে নেয়ার সুযোগ এখন অবারিত। ইতোমধ্যে নানা জীব উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন কর্তন করে নিয়ে ফসলে সংযোজন করে দিয়ে পাওয়া গেছে বেশ কিছু জিএম ফসলের জাত। এ ক্ষেত্রেও এর সফল প্রয়োগ করা গেলে আমাদের ফসলগুলোতেও অযৌন উপায়ে বীজ উৎপাদন করা আর অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। সে রকম একটি সুখবর পাওয়ার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি।

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার রায়ের গাঁও গ্রামে ১৯৫৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুর রশীদ ভূঁইয়া এবং মাতার নাম সুফিয়া খাতুন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক এবং কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ অব এবারেস্টউইথ থেকে উদ্ভিদ প্রজননে দ্বিতীয়বার স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন (জীব প্রযুক্তি) বিষয়ের উপর পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সনে প্রভাষক হিসেবে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটে কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত রয়েছেন। তিনি কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন এবং জীব প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সিস্টেম (সাউরেস)-এর পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি ডীন, পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি একজন গবেষক ও উদ্ভাবক। তিনি বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের মূখ্য গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখনও করছেন। তিনি তার গবেষণার ফলশ্রুতিতে এসএইউ সরিষা-১ এবং এসএইউ সরিষা-২ নামে দু'টি সরিষা জাত উদ্ভাবন করেছেন যা কৃষকের নিকট চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাছাই কমিটির সদস্য। তিনি একজন গ্রন্থকার ও বিজ্ঞান লেখক। তিনি ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নানা বিষয় নিয়ে মোট ৮টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো- উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ প্রজনন ও বিবর্তন, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন শব্দকোষ, জেনেটিক্যালী মডিফাইড ফসল - বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ফসলের উন্নয়ন-বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, Plant Tissue Culture, ফসলের উন্নয়ন ও প্রযুক্তি এবং ধান-উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিত।

তিনি নিয়মিত দেশের বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান পত্রিকায় কৃষি বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ওপর জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশ করে যাচ্ছেন। তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা ৫১টি। কৃষির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে তিনি জাতীয় ও আন্তজার্তিক সেমিনার বা ওয়ার্কশপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গবেষণা পত্রের সংখ্যা ৫৬টি। তিনি Journal of Agricultural Sciences and Technology জার্নালটির প্রথমে সম্পাদক ও পরবর্তীতে মূখ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল Journal of Sher-e-Bangla Agricultural University প্রকাশিত হয় এবং তিনি তিন বছর এ জার্নালটির মূখ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। তিনি জাতীয় ও আন্তজার্তিক বেশ কয়েকটি কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনে সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সহ-সম্পাদনাও করেন। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে- হাইব্রিড ধান প্রযুক্তি, Proceedings of the International Conference on Plant Breeding and Seed for Food Security, Plant Genetic Resources of Bangladesh 2012 অন্যতম। তিনি বাংলাদেশের কৃষির বিষয় ভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন 'বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতির' সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। বর্তমানে তিনি এই পেশাজীবী সংগঠনটির সভাপতি। এছাড়াও তিনি বেশ ক'টি পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য।

তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃষির বহু ছাত্র-ছাত্রী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছে। এখনও তিনি বেশ কয়েকজন এম.এস. ও পি-এইচ.ডি. ছাত্র-ছাত্রীর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

যে অনেক আকাঙ্ক্ষার ধন হবে তা সহজেই অনুমান করা চলে। সে কারণেই ঋতু ভিত্তিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ যেন ফসলের দেহ কোষ আবাদ করে পাওয়া যায় সে লক্ষ্যে গবেষণা চলছে পৃথিবীর বেশ কিছু সংখ্যক গবেষণাগারে। এরকম গবেষণার ফলাফল বেশ আশাবাদি করে তুলছে আমাদের।

ফসলের দেহ কোষ থেকে সংগৃহীত কোষ বা টিস্যু কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করলে আমরা দু'ভাবে উদ্ভিদ পুনরুৎপাদন করতে পারি। এর একটি হলো উদ্ভিদের অঙ্গ উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ উৎপাদন যাকে বলা হয় মরফোজেনেসিস। আর অন্যটি হলো অঙ্গজ ভ্রুণ সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভিদ উৎপাদন যাকে এমব্রায়োজেনেসিস বলা হয়। ফসলের কৃত্রিম বীজ সৃষ্টির ধারনাটি কিন্তু এসেছে অঙ্গজ ভ্রুণ বিকাশ বা সোমাটিক এমব্রায়োজেনেসিস কৌশলকে অবলম্বন করে। কালচার কোষ কলা মিডিয়াকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফসলের সঠিক কোষকলা বা অঙ্গাণু নির্বাচন করে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়াতে তা আবাদ করা গেলে অঙ্গজ কোষ-কলা থেকে অঙ্গজ ভ্রুণ তৈরি করা আজ আর কোন কঠিন কাজ নয়। অনেক ফসলেই অঙ্গজ ভ্রুণ পাওয়া এখন বেশ সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বীজ সৃষ্টির প্রশ্ন এলেই বীজের প্রাণ ভ্রুণের কথা না এসে পারেনা। ভ্রুণহীন বীজও কিন্তু বীজ। সে বীজ উদ্ভিদ উৎপাদনে ব্যর্থ হলেও খাবার হিসেবে একে ব্যবহারে কোন বাধা নেই। তবে ফসল ফলাবার কাজে বীজ ব্যবহার করলে সে বীজে ভ্রুণ থাকতেই হবে। ফলে বীজ সে প্রকৃত হোক আর কৃত্রিমই হোক এতে ভ্রুণ থাকা অত্যন্ত জরুরী। মজার বিষয় এই যে, গর্ভাশয়ের ডিম্বকের মধ্যে অবস্থিত ডিম্বকোষ নিষেকের মাধ্যমে সৃষ্ট যৌন ভ্রুণ আর টিস্যু কালচার করে পাওয়া অঙ্গজ বা অযৌন ভ্রুণের মধ্যে রয়েছে দারুন মিল। পূর্ণাঙ্গ ভ্রুণ রূপে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে ভ্রুণ বিকাশের যে নানা ধাপ রয়েছে এ দু'ক্ষেত্রে সে সব ধাপে বেশ মিল রয়েছে। অযৌন আর যৌন ভ্রুণ বিকাশের ক্ষেত্রে মিলের পাশাপাশি কিছু কিছু অমিলও যে নেই তা কিন্তু নয়। তবে এ ক্ষুদ্র পার্থক্য ভ্রুণ সৃষ্টিতে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না।

এতো গেল ভ্রুণ আর ভ্রুণ বিকাশের কথা। বীজে ভ্রুণ অত্যাবশ্যক সন্দেহ নেই। পাশাপাশি ভ্রুণ যেন নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকতে পারে সে ব্যবস্থাও থাকতে হবে বীজের ভেতর। এজন্য প্রয়োজন এর খাদ্যের নিরবছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা। যৌন বীজে ভ্রুণের খাদ্য হিসেবে জমা রয়েছে এর সস্য বা এণ্ডোস্পার্মে। ভ্রুণ এর প্রয়োজন মাফিক এ থেকে খাদ্যের চাহিদা মেটায়। অঙ্গজ ভ্রুণ কেবল ভ্রুণ হিসেবেই তৈরি হয় টিস্যু কালচার মিডিয়াতে। এর যেমন নিজস্ব কোন খাদ্যের উৎস নেই, তেমনি নেই কোন প্রতিরক্ষা আবরণী। কৃত্রিম বীজে তাই ভ্রুণের খাদ্যের যেমন,